Vol. 10 | No. 1 | 1966

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য

Volume	10
Issue	1
Year	1966
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hasan Hafizur Rahman
Published online	June 15, 1966
DOI	10.62328/sp.v10i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v10i1.3
Pages	67-118
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য

হাসান হাফিজুর রহমান

॥ ১ ॥

ত্রিশের কাব্যাদর্শের সঙ্গে আমাদের যে সকল কবি সংলগ্ন হতে পেরেছিলেন, সৈয়দ আলী আহ্সান তাঁদেরই সমসাময়িক হলেও, এ-কথা মনে করার কারণ আছে যে, ত্রিশের ধারাকেই তাঁর কাব্যের নিশ্চিত স্থিরীকৃত উৎস হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া তাঁর পক্ষে কখনো পুরোপুরি সম্ভব হয় নি। ফলে তাঁর সমসাময়িক কবিদের মত ত্রিশের পর্যায়ের কোন-না-কোন মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁর আত্মস্থ সংযোগ ঘটেনি। ক্রান্তি-কালের অস্থিরতায় তিনি যেন আগে থাকতেই অসংলগ্ন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমসাময়িক অনেক উৎক্ষেপ ছুয়ে গেছেনই শুধু—মানসিক কিংবা চেতনাগত দিক থেকে এই যুগাদর্শ সামগ্রিকভাবে তাঁর মনের পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হিসিবে স্থায়ী হতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। এ-কারণে লক্ষণীয় যে, সৈয়দ আলী আহ্সানের ধর্ম-ভিত্তিক আদর্শ-চেতনা আছে, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা নেই; কাল ও পরিস্থিতি-সম্পৃক্তি রয়েছে, কিন্তু সেটাও বিচ্ছিন্ন প্রক্ষেপের ঊর্ধ্বে উঠে কোন ধারণাগত পারম্পর্যে প্রসারিত নয়। অন্যপক্ষে ত্রিশের যুগের উত্তুঙ্গ সমাজ-বোধও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি সর্বাংশে।

সৈয়দ আলী আহসানের এই আপাতঃ-অসংলগ্নতার দায় যদি এই তথ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় যে, তিনি কোন পরিণত বা পূর্বাপর সংগ্রহিত ধারণায় উজ্জীবিত নন কিংবা তিনি সমাজ বা যুগ-সচেতন নন, তা'হলে হয়তো ভুল করা হবে। কেননা তাঁর এই অস্থিরতার মূল প্ররোচনাটা সম্ভবতঃ এই যে, তাঁর সমসাময়িক অনুসৃত ধারণা ও সংশ্লিষ্ট

সামাজিক উপকরণে তাঁর শিল্পবোধ তেমন উৎসাহ পায় নি। সৈয়দ আলী আহসান—নিরাবলম্ব কাব্যের জন্যই কাব্য—এমন ধারণার অনুসারী না হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর জন্য একথা সত্য এবং এর প্রকৃত কারণটা এই যে, সৈয়দ আলী আহসান অভিজাত মনোভাবের কবি। বস্তুতঃ এই অভিজাত মনোভাবের প্যাটার্ণ আন্তর্জাতিক কাব্য-নিরীক্ষায় যেমন নির্ধারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, বাংলা কাব্যের যজ্ঞশালায় এর তেমন পরীক্ষা হয় নি। সে কারণে এমন একটা মানসিকতার উত্তরাধিকারে দেশনিরপেক্ষ ব্যাপকতর সাযুজ্যে তাঁর মনে পটভূমিগত সংযোগবোধ থাকলেও, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যগত উপকরণে এর সমার্থক ও সহায়ক উপাদান তাঁর পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় নি। ফলে উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে অনেকাংশেই এককভাবে অনুসন্ধান করতে হয়েছে, আত্ম উদঘাটনের স্বাভাবিক ভিত্তিপট এবং বিষয় ও বক্তব্যের খোঁজে তাঁকে হ'তে হয়েছে অনির্দিষ্ট, ব্যাকুল ও চঞ্চলমনা। এইখানেই তাঁর সঙ্কট এবং এই জন্যই সাম্প্রতিকতার নানা বিচ্ছিন্ন প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করলেও সেসব তাঁর মধ্যে স্থায়ী হতে পারে নি।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে 'অনেক আকাশ' এবং 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থ দুটি পাশাপাশি উপস্থিত করা যায়। 'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসানের উপজীব্য বহুধাবিস্রস্ত। পরিশীলিত মন ও প্রতিশ্রুতিশীল মেধার পরিচয় এতে বিধৃত থাকলেও, সুনিশ্চিত সংস্থানে কোথাও তিনি স্থির নন। ভিত্তিগত প্রতিষ্ঠা সংস্থাপিত নয় এ গ্রন্থে। নির্দিষ্ট মনোভংগী, বিষয়চেতনা, জীবনদৃষ্টি এবং মেজাজ-নির্ভর আঙ্গিকের প্রত্যয়ী ও স্পষ্ট বহিপ্রর্কাশের অভাব রয়েছে এতে। সে হিসেবে একজন সম্ভাবনাশীল কবির প্রথম গ্রন্থ বলতে যা বুঝায় এ বই ঠিক তাই, তার বেশী কিছু নয়। এই পর্যায়ে সৈয়দ আলী আহসান অন্বেষাকাতর। মনোমত ঠাঁইয়ের খোঁজে উদ্‌গ্রীব উড্ডীন পাখীর মতই তিনি যেন অস্থির এতে। কিন্তু এই বিচার 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত'র বেলায় খাটে না। একটা প্রামাণ্য দৃষ্টান্তের শরণ নেওয়া যাক। "আমার পূর্ব বাংলা" কবিতাত্রয় 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের প্রতিনিধিস্থানীয়

কবিতা এবং সম্ভবতঃ সৈয়দ আলী আহসানের মানস-তৃষ্ণার আনুকূল্যে সবচেয়ে সাড়া-দেওয়া এই কবিতাত্রয়। যখন তিনি বলেন,

এখানে নদীর মত এক দেশ
শান্ত, স্ফীত কল্লোলময়ী
বিচিত্ররূপিনী অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন
এ-আমার পূর্ব বাংলা
যার উপমা একটি শান্ত শীতল নদী।

(—আমার পূর্ব বাংলা : এক)

কিংবা

কাকের চোখের মত কালোচুল
এলিয়ে
পানিতে পা ডুবিয়ে—রাঙা উৎপল
যা'র উপমা
হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে
দেহ ঘিরে
যে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল—
তুমি আমার পূর্ব বাংলা
পুলকিত স্বচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ

(—আমার পূর্ব বাংলা : দুই)

কিংবা

আমার পূর্ব-বাংলা অনেক রাতে গাছের
পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো
কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনও বেহালা—
এক সময় বাঁশীর সুর
যখন রাত্রে একাকী ঘুম ভাঙে
অনবরত কোমল কোলাহলে
স্বপ্নের মত পাতায় পাতায়
শব্দকে দেখি

তার আকুল বিকাশ
অন্ধকার আকাশের চেতনার মতো

যে-চেতনা এক সময় অতল অবলুপ্তি
এক সময় কালো চোখের তন্দ্রা
এক সময় বিদ্যুৎ বিকাশ
এক সময় হঠাৎ জাগরিত বজ্র
কিন্তু চিরকাল অনেক গন্ধ, শব্দ এবং
চোখ-চেয়ে-দেখার কথায়
ভরপুর
আমার পূর্ব বাংলা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো

(—আমার পূর্ব বাংলা : তিন)

তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, সৈয়দ আলী আহসান অবলীলায় সঞ্চরণের উপযোগী ভিত্তি পেয়ে গেছেন—বিষয়, বক্তব্য এবং বহিপ্রর্কাশের সংগত যোগাযোগ ঘটে গেছে। একটি করে বাক্যে গঠিত এই কবিতা তিনটি। খণ্ড খণ্ড চিত্রে ও চিত্রকল্পে একটি অখণ্ড রূপকল্পের সৃজন প্রয়াসের মধ্যেই এ কবিতা-ত্রয়ের আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্য। খণ্ডের সমাহারে অখণ্ড পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যিক দ্যোতনায় একটি সম্পূর্ণতা-আনয়নের প্রয়াসে কবিতা তিনটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা শিহরিত আলোড়ন বয়ে গেছে। কবির মনের গভীরে দেশ সম্পর্কে তাঁর আজীবনের ধারণা, দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা, দেশবাসী যেভাবে প্রকৃতি ও জন্মভূমিকে ভোগ করে ও ভালবাসে, সে সম্পর্কে উপলব্ধি এবং প্রকৃতি ও মানুষের মিশ্রিত জীবন-সংগ্রাম ও ঐতিহ্যলালিত চিরাচরিত মনোভংগী, রসগ্রাহিতা ও আত্ম-উন্মোচনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি যেমন করে ছবিতে ও চিন্তায় ধীরে ধীরে সঞ্জাত হয়েছিল, সে সবই যেন এই কবিতায় এক সচ্ছল প্রবাহে একসঙ্গে উৎসারিত। এই সঙ্গে মিলিত হয়েছে কবির আধুনিক দেখার ভংগী, রসচেতনার বৈশিষ্ট্য, মানস-প্রকৃতির নিজস্ব উদ্‌বেজনা ও শিল্পধারণা। এই সংহতি 'অনেক আকাশে' নেই। বরং এর অভাব সে ক্ষেত্রে সর্বত্র চোখে পড়ে।

আত্মপ্রকাশের উপরোক্ত পদ্ধতিতে সৈয়দ আলী আহসানের অভিজাত শৈলীমনা অভিব্যক্তি-উৎকণ্ঠা স্বস্তি পেয়েছে। দেশভিত্তিক বিমূর্ত ও সর্বজনীন গর্বিত বিচ্ছুরণে তাঁর রুচি এখানে দায়মুক্ত। সমস্ত উপাদানই পরিশীলন-পর্যায়ে

বাধামুক্ত, কবির স্বেচ্ছাধীন। তাঁর সজ্ঞানতা, তাঁর মূল্যবোধ তাঁর নিজস্ব প্রকরণে উপনীত, কোন পরম্পরায় নির্দেশিত নয়, বাঁধাও নয়। বৈদগ্ধ্যের অবারিত উৎসে অন্তর্ভূত শেষ পর্যন্ত হতে পেরেছে বলেই, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, ইতিহাস, সমকাল—সকল কিছুই সৈয়দ আলী আহসানের কাছে স্বচ্ছন্দ উপাদানে পরিণত হয়ে উঠেছে। এবং এইটে সম্ভব হয়েছে অ্যাবস্ট্রাকশন মোল্ডিং ডিসটরশনের মাধ্যমে এই সকল উপাদানকে একাকার করে, একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন রেখে তাঁর অভিজাত রুচি ও মার্জনার আধিপত্যে আনতে পারা গেছে বলেই। অথচ কংক্রিট অবস্থায় এসবই তাঁর হাতে কঠিন ও অনমনীয় উপকরণ হিসেবে 'অনেক আকাশে' কত অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের বেলায় স্পষ্টতঃ লক্ষণীয় যে, প্রথমতঃ এ-ক্ষেত্রে অধিকৃত ও জাজ্জ্বল্যমান সামাজিক উপকরণ ব্যবহারের প্রণোদনা নেই এবং চেতনার কাছে এর জন্য জবাবদিহিরও প্রশ্ন নেই। কেননা সৈয়দ আলী আহসানের চেতনায় সামাজিক সত্যের প্রতি আনুগত্য থাকলেও, এর প্রথাবদ্ধ উপযোগিতামূলকতা ও উপস্থাপনার প্রতি আদৌ প্রশ্রয় নেই। অন্যপক্ষে কবিতা ও শিল্পধারণা তাঁর কাছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এ-ক্ষেত্রে আঙ্গিকের প্রশ্নটাও তার কাছে মৌলিক ও মুখ্য! 'একক সন্ধ্যায় বসন্তে' এ-পর্যায়ে অনেকাংশে সমঝোতার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কোন পার্টিজান ধারণা-সূত্রের অংশীদার তাঁকে হতে হচ্ছে না বলে তাঁর অন্তর্নিহিত আপত্তি বা বিকার তাঁকে আড়ষ্ট এবং জড়তাপূর্ণও আর করে তুলছে না আগের মতো। অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব প্রবণতা ও প্রকৃতির সঙ্গে উপকরণ-সমাবেশ ও বহিপ্রর্কাশের দ্বন্দ্বজনিত পূর্বতন সঙ্কট এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে তিরোহিত এবং এইটে সম্ভব হয়েছে সৈয়দ আলী আহসানের বিশেষ মানস-প্রকৃতি এর পরিপার্শ্ব, ঐতিহ্য এবং এ সবের ব্যবহার-প্রকরণকে নিজের আধিপত্যে আনতে সক্ষম হয়েছে বলেই। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে স্বাধিকার প্রমত্ত থাকার মধ্যেই সৈয়দ আলী আহসানের সবচেয়ে বড় স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ। ত্রিশের কবিতা কবিকে এই মুক্তি দিতে নারাজ। অথচ ত্রিশের কবিতার প্রভাবশীল আবহাওয়াতেই তাঁর কবিতার প্রথম উন্মেষ। এবং এ কারণে প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, সৈয়দ আলী আহসান একটা পরিবর্তনের সাড়ায় যেন প্রথম থেকেই অব্যবস্থিতচিত্ত: ফলতঃ এই অব্যবস্থিতচিত্ততার অবদান তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'অনেক আকাশ' এবং তাঁর মানস-অনুকুল

পরিস্থিতির সন্ধানলাভে অনেকাংশে স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দে প্রতিফলিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'একক সন্ধ্যায় বসন্তে'। প্রথম গ্রন্থের প্রেরণা সমসাময়িক বাংলা কবিতা, যেখানে তাঁর মনের সঙ্গে খাপ-না-খাওয়া অজস্র প্রবর্তনায় বিজড়িত হয়ে তিনি সঙ্কটাকীর্ণ। দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি নিজস্ব মানস-প্রকৃতির অনুকূল ভিত্তি পেয়ে সহজ ও স্বচ্ছল, স্বেচ্ছাবিহারী এবং এর প্রেরণা বহুলাংশেই যে পাশ্চাত্যের উন্নত কাব্য-সম্পদের উৎকর্ষের সঙ্গে যোগাযোগে লব্ধ এতে কোন সন্দেহই নেই।

সৈয়দ আলী আহসানের এই সহজাত মানস-প্রকৃতিকে আমি 'অভিজাত-মানস' বলে অভিহিত করতে চেয়েছি। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নতুন খাতে প্রবাহিত আমাদের বর্তমান সাহিত্যের ধারায় প্রথমাবধিই যে মধ্যবিত্ত প্রবণতা কার্যকরী ছিল অবশেষে তাই নিরঙ্কুশ ও অবারিত ক্ষেত্র পেয়ে গেছে, যদিও ফিউডাল প্রভাবের উপস্থিতি এতে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে ঘটেছিল। কিন্তু বুর্জোয়সির প্রতিনিধিত্বমূলক বিষয় বা দৃষ্টিকোণের কোনটারই প্রসার বা পরিচর্যা বাংলা সাহিত্যে তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে নি বা নিয়ামক শক্তি অর্জন করতে পারে নি। ১৯৪৫ সনের পর অবশ্য ফিউডাল মূল্যবোধের পুনরাবৃত্তির প্রশ্নই ওঠে না। বুর্জোয় ঐতিহ্যও বাংলা কাব্যে পরিহৃত—মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণেও এর সঙ্গে সংলগ্নতা আমাদের কবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না—এই অবস্থায় সৈয়দ আলী আহসানের অভিজাত মনোভাব শ্রেণী ও সংস্থা নিরপেক্ষ এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সমন্বয়ে স্বস্তি খুঁজেছে যেন অনবরত। অবশেষে ফিউডাল বৈদগ্ধ্য এবং বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকতার বিমূর্ত প্রভাবই তাঁর স্বভাবকে সংগঠিত করে সমার্থক উপকরণ ব্যবহারের উপযুক্ত করে তুলেছে। এইসঙ্গে ত্রিশের যুগের প্রকরণগত বৃত্তিসমূহ (যেমন বিশ্লেষণাত্মকতা) তাঁর কাব্যের গঠনকলার সহায়ক হয়ে উঠেছে। ফলে সৈয়দ আলী আহসানের অভিজাত মনোভাবকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় রুচি, মেজাজ এবং পরিশীলিত ও অবারিত সঞ্চরণে, অভিজাত সংরক্ষণশীলতা এবং বিষয় ও বক্তব্যের প্রবণতায় নয়। বরং রেঁনেসার বিতর্ক-ঊর্ধ্ব সর্বজনীন ও বিমূর্ত ব্যক্তি ও স্বদেশচেতনা এর সঙ্গে সংযোজিত হয়ে তাঁর মানসশিকড়কে গভীরতর ভিত্তিতে প্রোথিত করেছে এবং তা অন্তরঙ্গ শক্তি ও প্রত্যয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।

অন্যপক্ষে ত্রিশের যুক্তিবাদী আধুনিক মনোভঙ্গী তিনি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ত্রিশের সমাজবাদী ও মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির সঙ্গে এক হতে, কোন পার্টিজান মুখরতায় তৎপর হতে সবসময়ই তাঁকে মনস্তাত্ত্বিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ জন্যেই বোধ ও প্রবর্তনার অসামঞ্জস্য এবং ভাষার জড়তায় সঙ্কটাকীর্ণ অবস্থা তাঁর প্রথম দিকের প্রয়াসে লক্ষ্য করি। কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করে এর বহিঃপ্রকাশের অনুকূল উপাদান-গ্রহনেও সফল হয়ে উঠতে পেরেছেন অবশেষে, তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থটি তারই স্বাক্ষর। বস্তুতঃ এই মনোভাবই পরবর্তী কবিতার পর্যায়ে আবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের চেতনায় ও তৎপরতায় ক্রান্তিকালের বীজ হিসেবে কাজ করেছে। প্রথমে তা অবচেতনে ছিল এবং অস্থিরতার মাধ্যমে তাঁকে অনবরত উৎক্ষিপ্ত করে অবশেষে তা এক সচেতন ও সুস্থির বিকাশোন্মুখ পটে উপনীত হওয়ার পথ দেখিয়েছে তাঁকে। এই স্বাভাবিক ভিত্তি অর্জনে সৈয়দ আলী আহসানের দীর্ঘ সময় লেগেছে (প্রায় পনেরো বছর: '৪৫—'৬০)। কারণ বোধকরি এক্ষেত্রে তাঁর নিঃসঙ্গতা। পরিশেষে বিদেশী কাব্য-ঐতিহ্য থেকে সতর্ক ব্যক্তিগত পরিগ্রহণই তাঁকে পথের সন্ধান দিয়েছে বলে মনে হয়।

এই আলোচনার মূল কথাটি এই যে, সৈয়দ আলী আহসান চল্লিশের দশকে কবিতা লেখা শুরু করলেও সাম্প্রতিকতম কবিতার উজ্জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তবে তিনি আত্মগত প্রেক্ষিত খুঁজে পেয়েছেন এবং সেই হিসেবে তিনি আমাদের সাম্প্রতিকতম নিরীক্ষণরত অগ্রগামী কবিদেরই একজন। তাঁর ক্ষেত্রে এই আবর্তনকে মোড় ফেরা বলা যায় না, বরং উপযোগী পরিস্থিতির সন্ধানলাভ বলাই যথাযথ। এই পর্যায়ে তিনি মূলগতভাবে যে উপজীব্যগুলির উপর নির্ভর করেছেন সেগুলো হল দেশ, কাল, ব্যক্তি ও শাশ্বত জীবনবোধমূলক ঐতিহ্য-মিশ্রিত কতিপয় বিমূর্ত অনুভূতি। আঙ্গিকগতভাবে তিনি চূর্ণ উপমা, দেশী ও বিদেশী উল্লেখের মিশ্রিত উপস্থাপনা এবং এ-সকলকেই তাঁর প্রবণতা-অনুযায়ী বাধ্যমুক্ত ব্যবহারের জন্যেই প্রধানতঃ আশ্রয় নিয়েছেন পদ্য ছন্দের। এ-ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা সংস্থিত এবং পূর্বতন আড়ষ্টতামুক্ত তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক কাব্য-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সৈয়দ আলী আহসানের

বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর পরিপার্শ্বকে সর্বতোপায়ে এ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে গ্রহণ করেন, বয়সের আনুকূল্যে এই সময়ের আবহে স্বাভাবিকভাবে উজ্জীবিত অন্যান্য তরুণতর কবির বেলায় যা সত্য নয়। এর কারণ এই যে, প্রথমতঃ দ্বন্দ্বের পথ অতিক্রম করে তাঁকে এই সমন্বয়ে উপনীত হতে হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ অনিবার্য অভিজাত মানসের পক্ষে বর্তমানের পটভূমিতে এইভাবে উৎসারিত হওয়া ছাড়া সহজতর পন্থাও নেই। মৌল স্বভাবের আভ্যন্তরীণ তাগিদে নিজস্ব ফলশ্রুতিতে উপনীত হওয়ার এই জটিল সঞ্চরণ কাব্য-উদ্যমের বিচিত্র জটলায় এক উপাদেয় তথ্য বৈকি!

কিছু দৃষ্টান্তের সহায়তা নেওয়া যাক:

(১) মানুষের কামনায় ধানের শীষ
হলুদ হয়েছে
কত অনুতাপ প্রলাপ কত বিষ
অনেক আনন্দে রমণী পদ্মিনী
সময় তো উল্লাসের মতো
হাসাহাসি অথবা সচকিত বাতাস
এবং মুহূর্তের সচেতনতায় আমি
পৃথিবী।

অনেক অবিনশ্বর একটি
অস্পষ্ট সাড়া
প্রথম উচ্চারিত বাণী থেকে
আজ পর্যন্ত কত না পদক্ষেপ
স্নেহ শৈথিল্যে আমি তার স্রোতে
নিশ্চিহ্ন হব
সময়ের বিগলিত নিদ্রায় মিশে যেয়েই
আমার সার্থকতা।

মাঠ, ঘাস, বাড়ী, দিন আর ধুলো
আশা-আশ্বাসে দিন আর রাত
গ'ড়ে তোলা
সামান্য কৌশল—বুড়ো কৃষাণকে

জীবনের সুরে স্বপ্নে সত্যে
জাগানো
এবং তা হলেই আমি একটি
আনন্দিত নদীর মতো গান।
(—অনবরত, 'সমকাল' : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯)

(২) এখন নিশ্চিন্ত কর্মে যন্ত্রণার প্রতিষ্ঠা করেছি
যার স্বাদ নেই—
নৈমিত্তিকতায় তা' একান্ত
মেঘে মেঘে একাকার আকাশ—
তাই বৃষ্টির ভয় আনলো
সমস্ত সুর পলাশ-মেঘে ছড়িয়েছিলো
সমস্ত স্বপ্নের উপার্জন আজকের অপরাহ্নে
মিশে গেছে

হে সুন্দর আমার নিঃস্ব সম্ভ্রমে
আবার আনন্দকে দাও।
(—বিকেল আকাশের মেঘ, 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত')

(৩) এভাবেই আমার দিন রাত্রির অধীরতা
অনেক বনের মধ্য দিয়ে
অনেক নদী সমুদ্রের স্বচ্ছতায়
একদিন হয়তো পাহাড়ের দুর্গমতায়
পাথরের নিশ্চেতন সঙ্কট পার হয়ে
ইউলিসিস ইথাকায় ফিরবে।

সেদিনের অপেক্ষায়
দুঃখের ঐশ্বর্যকে মেনে নিই
আমি আমার ভাষা হারাই
যেখানে হঠাৎ তোমার নামে এসে
আমার সমস্ত বলা থামে
আর আমার একাকী বিসর্জিত দেহ
আকুল হয় আকাশকে পাবার জন্য॥
(—প্রার্থনা, 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত')

নিঃসন্দেহে এই উদ্ধৃতিগুলো অন্তরঙ্গ বিমূর্ত বিষয়। অথচ পরিপার্শ্ব-ও প্রেক্ষিত-নিরপেক্ষ তো নয়-ই, এমন কি প্রেমও ("প্রার্থনা": তৃতীয় উদ্ধৃতি) লীলায়িত জীবনায়নে সংগ্রথিত। সাম্প্রতিক দ্বন্দ্ব-উদ্ভূত চিহ্নিত সত্যে এ সংশ্লিষ্ট নয়, তবু দেশকালের প্রতিক্রিয়াতেই এই অনুভূতি সঞ্জাত। শ্রেণী-মানসের বিশিষ্ট কাঠামোয় একে ধরা যায় না বটে, কিন্তু এ নিজস্ব শিকড়-সজাগ এবং মানবিক ঐতিহ্যেই এর মূল। এতেই ধারণা করা যায় সৈয়দ আলী আহসানের অভিজাত মানসের বোধ ও বিষয়ের মধ্যে সমন্বয়-সাধন প্রক্রিয়ার স্বরূপ। এই মানসের পক্ষে সহজতর পন্থা ছিল কবিতাকে নিছক শিল্প হিসেবেই মেনে নেওয়াতেই! কিন্তু তাঁর পূর্বাপর-সজ্ঞান অধিকতর সচেতন ধারণা তাঁকে বরং দুরূহতর অভিনিবেশে প্রণোদিত করে শিল্পের সঙ্গে জীবনের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। এখানেই সৈয়দ আলী আহসানের বিশেষত্ব এবং তাঁর মনের কঠিন এই চাহিদা মেটাতে এত ব্যর্থতার পথ পার হয়ে তবে দিশে পাওয়া। এই কথার সাক্ষ্যে আমি 'মানুষের কামনায় ধানের শীষ হলুদ হয়েছে', 'বুড়ো কৃষাণকে জীবনের বিচিত্র সুরে জাগানো এবং তা'হলেই আমি একটি আনন্দিত নদীর মতো গান', 'হে সুন্দর আমার নিঃস্ব সম্ভ্রমে আবার আনন্দকে দাও" 'ইউলিসিস ইথাকায় ফিরবে' প্রভৃতি পংক্তি এবং "আমার পূর্ব-বাংলা" কবিতাগুচ্ছের উল্লেখ করতে চাই। দেশজ সংলগ্নতা কিভাবে আন্তঃ-দেশে প্রসৃত এবং তীক্ষ্ণ মুগ্ধ স্বাজাতিকতা কিভাবে আন্তর্জাতিকতায় মিশ্রিত, তা যেমন এ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তেমনি সমসাময়িক চেতনাও এতে বিধৃত। কিন্তু এ সবই ফুটে উঠেছে বাংলার অবিমিশ্র ঐতিহ্যপটে। এই নিজস্ব পটও আবার অভিজাত-মানসেরই অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। তার অর্থ, অভিজাত মন নিজের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অনুষঙ্গে মেলাতে না পারলে কোন উদ্‌বেজনাতেই উচ্চকিত হয় না। বিমূর্ত বাংলার পটই তার আবহমানের সজ্জায় সৈয়দ আলী আহসানের নন্দিত, গৌরবমণ্ডিত স্বাতন্ত্র্য-স্বস্তি। এই ভিত্তির একাকারিত্বই তাঁকে কাব্য তথা শিল্প ধারণা এবং মানুষ তথা জীবন সম্পর্কবোধকে একাধারে সংস্থাপিত করতে প্রেরণা দিয়েছে।

'মানুষের কামনায় ধানের শীষ হলুদ হয়েছে' এবং 'সমস্ত শব্দের একাগ্রতায় আমার পূর্ব-বাংলা' উক্তি দুটো শিল্প-সফল বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য,

রবীন্দ্রনাথ, সংস্কৃত আলঙ্কারিক, মালার্মে প্রমুখের কাব্যধারণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে পরবর্তী সময়ের কবিতাগুলোতে 'অনবরত' ও 'শব্দ' শব্দ দুটোর বারবার প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'অনবরত' শব্দটি টাইম ইটারনিটি তথা কাব্যে চিরন্তনতার দ্যোতক আর 'শব্দ' শব্দটি নিজে 'শব্দই কবিতা'—এই শিল্প-ধারণার স্মারক। 'শব্দ' শব্দটির বারবার সচেতন ব্যবহারে কবি যেন বস্তুজগত ও জীবনজগতকে শব্দ জগতের চিরন্তনতার মধ্যে সংস্থাপিত করতে চান। অবশ্য টি, এস, এলিয়ট 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'র এক জায়গায় "when lovely women stoops to folly"—'ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র এই বাক্যাংশটিকে যে অর্থে ও উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেছেন; সৈয়দ আলী আহসানের 'মানুষের কামনায় ধানের শীষ হলুদ হয়েছে' পংক্তিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ (আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ) সে অর্থে উপস্থিত নন। এলিয়টে উদ্ঘাটনী উপায় হিসেবে ব্যাজার্থে ভিকার অব ওয়েকফিল্ডের বাক্যাংশটি ব্যবহৃত, কিন্তু সৈয়দ আলী আহসান এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারণারই উপর নির্ভরশীল যদিও বিষয় ও প্রয়োগ ধারণায় এবং প্রেক্ষিতের চেতনায় এই দু'জনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যও অনেকখানি। এমনকি আধুনিক বাংলা কবিতায় কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের পংক্তি যে ভাবে নিজেদের কবিতায় সংযোজিত করেছেন, সৈয়দ আলী আহসানের পদ্ধতিও তা নয়। উক্ত ব্যবহারগুলো প্রতিভাস সৃষ্টিতে বা উদ্ঘাটনী উদ্দেশ্যে, কিংবা ব্যাজার্থে বা বৈপরীত্যের আবহ-আনয়নে ব্যবহৃত। কিন্তু সৈয়দ আলী আহসানে এই প্রয়াস সহায়ক ঐতিহ্যিক অবলম্বন ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ সৈয়দ আলী আহসান পরিপূর্ণভাবে সিনসিয়ার; বিতর্ক, বিচার ও তীর্যকতা নয়, উৎসর্গিত নিবেদনেই তিনি সবচেয়ে শিল্পসম্মত হতে পারেন। গরিমাযুক্ত মূল্যবান ঐতিহ্যিক বিচ্ছুরণের কোন উপাদানই তাঁর পক্ষে প্রাণঢালা উপাচারে পরিণত না করে পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

অভিজাত-মানস বিদগ্ধ মনের প্রায় সমার্থক। এই মনে রসসৃজনের একমাত্র প্রেরণাই হল শিল্পশুদ্ধতা। সৈয়দ আলী আহসানের বিশেষত্ব এই যে, শিল্পবোধের সঙ্গে জীবনশীলতার সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছেন। অবশ্য এ কথা আমি আগেই বলেছি। বস্তুতঃ একপক্ষে সমাজ ও সময় এবং অন্যপক্ষে চিরন্তনতা ও শব্দরূপময়তা এক পাদপীঠে সমন্বিত করার প্রয়াস সাম্প্রতিক

কাব্য-আন্দোলনেরই একটি হৃতপ্রাপ্ত ফল। সৈয়দ আলী আহসান এই সাম্প্রতিক পুনরাবৃত্ত ফলশ্রুতিরই রূপকার এবং তাঁর এই নিরীক্ষণের প্রকরণ বিমূর্তকরণের নধ্যেই নিহিত—আমার এই প্রতিপাদ্য আশা করি উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর পর্যালোচনায় কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। আর একটি উদ্ধৃতি সহায়ক-দৃষ্টান্ত হিসেবে দিতে চাই। সৈয়দ আলী আহসান নিজেও তাঁর নিজস্ব ধারণায় এতে অত্যন্ত পরিষ্কার :

অনন্তে বিকশিত আনন্দ
শতদল পদ্মের মতো

কিন্তু মানুষ কি তখন চায় শুধু—
অর্থাৎ এ মুহূর্তে সর্ব মুহূর্তে—
যদিও অনবরত নিশ্বাস এবং অস্থি
এবং বিশ্বাস
জীর্ণ হয়—
অনন্তের আকাঙ্ক্ষা এবং সমর্থিত বাঁচা ?
... ...
সেইতো সম্পন্ন সম্পূর্ণ মানুষ
যে অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার সন্ধিলগ্নে
বাস করে
যে নিজেই সে-গোধূলিকাল
সর্বকাল।
একটি একাকী আবেগে এককালে
আরম্ভ এবং অন্তিমকে জানা
একটি নক্ষত্র দৃষ্টিতে সমন্বিত দেখা—
সম্পূর্ণকে দেখা,
শান্তিকে একটি চেতনায়
পৃথিবীকে এবং পৃথিবী-অতিক্রান্ত
সময়কে
এইতো অবিশ্রান্ত আলো
যে আলো আলোর অতীত
এইতো মুহূর্তের সঞ্চয়

একটি সময় যা কোনো
এক সময় নয়
এবং স্বাধীন সত্তায় জাগ্রত পুরুষ
সেই তো সম্পন্ন সম্পূর্ণ মানুষ।

(— সম্পন্ন মানুষ এবং গান, 'সমকাল'
বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা)

আমাদের স্বকালে মানব-সংস্থা হিসেবে আমাদের স্বজাতির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে অক্ষম, অসহায় ও যাচ্ঞাতুর আর্তনাদে ফেটে পড়া তাঁর রুচি ও মেজাজ-অনুযায়ীই সম্ভব নয়—অভিজাত-মনের এই ন্যূনতম অহঙ্কার তাঁরও আছে। তিনি বরং তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বদেশের মানুষগুলোর সম্পূর্ণতা ও উন্নতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণ করতে চেয়েছেন পরোক্ষে। 'সম্পন্ন মানুষ এবং গান' কবিতাটি তারই একটি বিশিষ্ট আলেখ্য। শিরোনাম থেকে উদ্ধৃতাংশটির সর্বত্র কবির এ চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট, যদিও অবশ্য এলিয়টের 'ড্রাই স্যালভেজেস' কবিতাটির প্রভাব এতে লক্ষ্য করা যায়। ইদানীং এই রকম নিশ্চিত, আত্মস্থ এবং বিশ্লেষাত্মক ধারণায় তিনি পরিণতিমুখী হতে চলেছেন বলে মনে হয়।

শিল্প এমন একটা বিষয় যা সাংগঠনিক আঘাত সম্পূর্ণ হজম করে অমেয় অনাবিল সম্পন্নতায় ফুটে ওঠে। আঙ্গিক, চেতনা ও উপকরণে অনবদ্য সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এতে, পশ্চাত-পরিশ্রমের কোন চিহ্নও থাকে না। দ্বন্দ্ব-বিশৃঙ্খল ও অগঠিত মনে এর স্বাভাবিক জন্ম তাই হতে পারে না। সৈয়দ আলী আহসানে শিল্পসৃষ্টির উপযোগী প্রস্তুতি অর্জিত হয়েছে, এ-কথা এখন হয়তো বলা যায়।

আমি পূর্বেই বলেছি সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আত্মস্থ উৎসারণে প্রধানতঃ গদ্য-ছন্দকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁর ভাষা স্বাভাবিক ও কাব্যিক হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গদ্য-ছন্দের একান্ত নির্ভরতায় কবিতার ধারাবাহিক বিকাশ সম্ভব কিনা, সে-প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় যায় না। সুধীন দত্ত যে বলেছেন, 'সেই বাক্যগুলিই অনায়াসে আমাদের মনে থাকে, যেগুলির মধ্যে যতির ব্যতিক্রম নেই'—অন্যান্য যুক্তি

বাদ দিলেন, শুধুমাত্র এই যুক্তিটাই এ বিষয়ে কম কথা নয়। সৈয়দ আলী আহসান কাব্যের শিল্পসত্তায় বিশ্বাসী; এই বিশ্বাসের অনুকূল উপাদান তিনি সংগঠিত করেছেন। শিল্প স্বভাবতঃই দীর্ঘায়ু হওয়ার দাবী রাখে। সুতরাং তাঁর আহৃত উপাদানকেও দীর্ঘায়ু করার আঙ্গিক তিনি খুঁজে নেবেন—এই প্রত্যাশা হয়তো অবান্তর নয়।

বলেছি, 'অনেক আকাশে'র কবিতাসমূহে দেখা গেছে, অনেক দায়, অনেক প্রশ্ন এবং আত্মমীমাংসার জড়িতাবস্থা যেন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। নিজের কাছে নিজেরই বাধা যেন তিনি কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছেন না, উন্মুক্ত অবারিত ক্ষেত্র যেন কিছুতেই পাচ্ছেন না। এই তথ্যের প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'উন্মুখ দেহের প্রাণ', 'তোমার মৃত্যুর শেষে', 'নায়িকা' কবিতাগুচ্ছ, 'তোমার দেহের তীরে', 'নতুন স্বাদ', 'প্যারিসের চিঠি' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়। 'প্যারিসের চিঠি' কবিতায় প্রক্ষিপ্ত যৌবনানুভূতিকে নৈতিকতার পোষণে প্রথাবদ্ধ দায়িত্বে কিভাবে পরিষ্কৃত করা হয়েছে, তা লক্ষণীয়। অপর কবিতাগুলোর অধিকাংশের বেলাতেও যৌন-সম্ভোগকে চিরন্তন মৃত্যুর প্রতীকে দেখেও কাব্যের এ্যাসথেটিক আনন্দকে যেন কিছুতেই অনাবিল করে তোলা সম্ভব হয় নি। কাব্যের সকল কোমল বিষয়ই উপস্থাপিত হচ্ছে উত্তরাধিকারসূত্রে, কিন্তু বক্তব্য নির্ভার কাব্য হয়ে উঠতে পারছে না কোনক্রমেই। তাই কোথাও মোরাল স্যাঙ্কশানের আবির্ভাব, কোথাও মনোবিকলনগত জরায়ণের আতিশয্য। গোলক ধাঁধাঁর আলোআঁধারি বৃত্তে সমস্ত উদ্যমটাই যেন আবর্তিত হচ্ছে। আর ছন্দের বেলাতেও 'অথবা' ধরনের শব্দের (যা কিছুতেই অনিবার্য নয়) বারবার প্রয়োগে যতিসমূহ ব্যাকরণভিত্তিক করতে হয়েছে এবং ক্রিয়াপদগুলোও কোথাও যেন স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারছে না—সমগ্র প্রতিফলনটাই যেন যান্ত্রিক ও রেওয়াজি, আত্মার সুর যেন লাগতেই পারছে না। 'অনেক আকাশে' তাই চিত্রহীন, অন্তরধ্বনিহীন স্মৃতিই প্রধান ভিত্তি। কোথাও কোথাও তা এতই ব্যক্তি-সংশ্লিষ্ট যে প্রাইভেট অর্থের বেশী ব্যঞ্জনাও সে সবের পক্ষে পরিগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি এবং প্রায়শঃই উপমাসমূহও প্রথাবদ্ধতার বাইরে এসে চঞ্চল হয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। সৈয়দ আলী আহসান এ-সংক্রান্ত অন্তরনিহিত সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ামাত্রই সরাসরি গদ্য-

ছন্দকেই অবলম্বন করে উৎসারিত হয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে উপকরণগত প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলেই ধরা যাক। এখন প্রকরণগত সাফল্য নির্ভর করছে এর আনুষঙ্গিক ছন্দ ও ধ্বনিতে একাত্ম হওয়ার মধ্যে। বলা বাহুল্য, গদ্য-ছন্দই এর একমাত্র অব্যাহত মাধ্যম হতে পারে না। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষা সম্প্রতি যে সজীবতা ও দ্যোতনার শিহরণ লাভ করেছে কাব্য-ছন্দের মধ্যেই তাকে শৃঙ্খলিত করার দ্বিতীয়-স্তরের নিরীক্ষায় তাঁকে পুনর্বার পরিশ্রমী হতেই হবে। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শিল্পবস্তুকে শিল্পপ্রাণ করে তোলা, চিরায়ু করে তোলা। শিল্পের অন্বিষ্টই তাই। এজন্যেই হয়তো বলা চলে যে, সৈয়দ আলী আহসানের প্রাথমিক সাফল্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব এ-ক্ষেত্রের দ্বিতীয়-সাফল্যের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করছে।

সৈয়দ আলী আহসানের মত সানাউল হকও দেশী ও বিদেশী কাব্য-সম্পদ থেকে নির্বিচারে আত্মসমিধ সংগ্রহ করেছেন। দুজনেরই উপজীব্য ব্যাপকতর অর্থে স্বদেশ, স্বকাল এবং স্বজাতি। দুজনের নির্ভরও আবহমান বাংলার নিরপেক্ষ ঐতিহ্যিক ললিত-পট। তবে এঁদের মধ্যে পার্থক্য এই যে :

সৈয়দ আলী আহসান মননধর্মী আর সানাউল হক চিত্রধর্মী।

সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি-উজ্জীবিত, সানাউল হক ঘটমানতা-উদ্বুদ্ধ।

সৈয়দ আলী আহসান নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত-প্রসূত এবং তাৎক্ষণিক বা প্রত্যক্ষ ফলাকাঙ্খায় নির্বিকার; কিন্তু সানাউল হক প্রয়োগবাদী. নির্দিষ্ট ফলাকাঙ্খী এবং যতদূর সম্ভব প্রসঙ্গলগ্ন।

একজনের মন অভিজাত, পরিশীলন ও বাছাইয়ে পরম স্বস্তি পান, সহজ উৎসাহ পান; অন্যজন সাধারণ বাঙালী মানসের উত্তরাধিকারী, এবং গ্রহণ ও সংযোজনের সীমা বাড়াতেই চূড়ান্ত আগ্রহশীল।

তবে দুজনেই উৎসারণে একান্তভাবেই সিনসিয়ার এবং প্রবর্তক না হয়েও কাব্যের কল্যাণকরী অপরোক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বাসী। তাঁদের এই সাযুজ্য ও পার্থক্যের মূলগত কারণ এই যে, তাঁরা মানসগতভাবে এক না হলেও চেতনাগতভাবে এক গোত্রের।

সৈয়দ আলী আহসানের উদ্ভাবনায় দেশ হল :

পানিতে পা ডুবিয়ে—রাঙা উৎপল
যা'র উপমা,
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে
দেহ ঘিরে
দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল—

এবং,

কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনো বেহালা—
এক সময় বাঁশীর সুর
এবং এ হল পুলকিত স্বচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

সিক্ত নীলাম্বরীতে আবহমানের অভিসারিকা বাঙালিনী-নারী ঐতিহ্যের গ্রথিত-মালায় দেশের সঙ্গে একাকার হয়েছে। স্নিগ্ধ তমালের উপমায় বাংলা কাব্যের এক প্রিয়তম নিকটতম পরিচিততম উল্লেখে আন্তরিকতম সংবেদনায় এ বিধৃত। আর কখনও মৃদঙ্গ, বেহালা ও বাঁশীর সুরে আপামর লোক-উৎসারণের সংশ্লেষে এ অবিমিশ্র। ঐতিহ্যের ও দেশজ বৈশিষ্ট্যের এই সংমিশ্রিত ব্যবহার কোন নির্দিষ্ট বোধকেন্দ্রিক বা নির্ধারিত আদর্শ ও বক্তব্য নির্দেশিত না হয়েও, এক ব্যাপক ও বৃহত্তর চেতনায় আশ্রয় লাভ করেছে। এই নির্বিরোধ ও নিরপেক্ষ অভিসারের অন্তরঙ্গ তাৎপর্যে কাব্যের দ্যোতনা সর্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছে। এমন কি বৈষ্ণব কবিতার ঐতিহ্যিক উপস্থিতি স্তবকটির পশ্চাতে স্বপ্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, একে যেমন কোন গণ্ডীভুক্ত করা সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় এতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা।

আর সানাউল হকে :

তীরে তীরে কতো না বন্ধন, নানা নীড় পাখি
কত বউ কলসিনী ধান ও ধ্বংসের ইতিহাস :
হাসিঝরা প্রিয়মুখ, ছলছল অভিমানী আঁখি ;
ভাঙামাঠ রাঙামাঠ একপাল মোরগাবি হাঁস।
কাশফুল গো-বাথান জেলেপাড়া বুড়ো কুঁজো বাড়ি :

এই নদী কারিগর তটশিল্পী হয়তোবা কবি—
ধ্যানী জ্ঞানী যাযাবর খেয়ালী কি আজন্ম নেশাড়ী:
বুকে গান ঠোঁটে রস কটিবাঁকে কত ফোটে ছবি।
(—"তিতাস: পূর্বরাগ", 'সূর্য অন্যতর')

কিংবা

দিগ্বিজয়ী দৃশ্যজয় কেমনে সম্ভব হয়
কে রাখে হিসেব;
কতো দৃশ্য ক্ষিপ্রকটি এলোকেশ জমা
সূর্যছোঁয়া গণ্ডদেশে, রূপচাঁদা দেহে
রোহিত চিতল খলসের নৃত্য দোলা
শাড়ির ঝলকে,
অন্য ছবি, জোছনার মন যদি ঝুপ করে নেমে
ডুব দিয়ে মাছ হয় চোখের পলকে।

এইখানে হরিৎকর্মা শর্ষে মাঠে
প্রজাপতি কবি,
ওইখানে ধানকাটা খড় নাড়া
নেড়া মাঠ পোড়া ছন্নছাড়া।
এই বাঁকে জেলেনীর শাড়ি
হাওয়ায় লুটায়—
অই দূরে বেদেনীর নাও
নিমেষে উধাও:
কুতুহলী ধ্যানী বক ঘাড় তুলে
আড় চোখে চায়॥
(—"দৃশ্যপরিক্রমা: তিতাস", 'সূর্য অন্যতর')

কিংবা

আমুণ্ড নেড়া শীতের দেশের গাছেরা
সে কি জড়াসন্ধ আমরা?
আমাদের প্রতীক্ষা থমকে থাকে না কি
কুয়াশা পল্বলে
কাঠের ভাঙা সিঁড়িতে
শিশির আক্রান্ত ফড়িঙের
পারস্ত ডানায়?

এবং ওই শীতার্থ গাছের মতো
আমরাও কি কম্পিত হিমে
হিমসিম খেয়ে
পৌষের পুকুরে নেয়ে
শিকড় সৌজন্যে
পরিচ্ছদের কথা ভুলে থাকি নে
কোনো এক ঘনপল্লবী সম্ভারের প্রত্যাশায়?
(—"শীতার্ত গাছ : একটি উপমা", 'সূর্য অন্তর')

বাঞ্ছিত ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পরিকল্পিত ও সুস্পষ্ট প্রতিফলনে ফলাকাঙ্ক্ষী কবি যেন সর্বতোভাবে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েছেন দেশের শিরা-উপশিরায়। ছবির পর ছবি — দেখার কোষাগার যেন অনিঃশেষ, উল্লেখেরও অন্ত নেই। একটিও যেন এড়িয়ে যেতে নারাজ। প্রত্যক্ষ ও প্রসঙ্গ-উচ্ছৃত সমগ্র জড়িত-পরিবেশ তাঁর প্রয়োগশালায় কথার পর কথা বলার জন্যে যেন অধীর, অস্থির। কোন বাছাই এবং পরিশীলনের যেন প্রয়োজনও নেই।

সৈয়দ আলী আহসানের উন্মুখতা মুডের অবদান এবং মুডের কাছেই এর আবেদন। কিন্তু সানাউল হক সার্বিক তৎপরতায় বিজড়িত এবং এর আবেদনও পাঠকের সুনির্দিষ্ট উজ্জীবন ও নির্দেশিত সক্রিয়তার কাছেই। পরোক্ষ হলেও কবির এই অভিপ্রায় কোথাও সংগুপ্ত নয়, এই ঈপ্সায় ক্ষান্তিও নেই। এইটে সমাজবাদী কাব্যধারার অনুচ্চকিত প্রভাবেরই ফল, যদিও এই প্রভাব সানাউল হকের মনের গোপন কক্ষেই সংসাধিত, কখনো সরবে সম্মুখে উপস্থাপিত নয়। এ-কারণেই সানাউল হকে সমাজ-চেতনা নিগূঢ়। সৈয়দ আলী আহসানে তা নয়। সৈয়দ আলী আহসানে বরং ঐতিহ্যবোধের একাগ্রতা সমাজচেতনতার পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। অন্যপক্ষে সমাজসচেতনতার সহিত একাত্মকতা সানাউল হককে পরিপার্শ্ব-স্ফূরিত প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বিত রূপায়ণে একাগ্র করে তুলেছে। ফলে সানাউল হকে যেখানে তাৎপর্য ব্যাখ্যানে মুখরতা লক্ষ্য করি, সেখানে সৈয়দ আলী আহসানে দেখি স্বল্পবাক আভাষ ও নির্বিকার গভীরতর দ্যোতনা। তাই সৈয়দ আলী আহসানে শিল্প-ব্যঞ্জনা বেশী, সানাউল হকে জীবন-ব্যঞ্জনার

আধিক্য। কিন্তু একটা ফলশ্রুতিতে এঁরা অংশীদার। সেটা আধুনিক-বোধের মার্জনা: এঁরা দু'জনেই সমকালীন সহৃদয় আধুনিক মন ও রুচির নিকট দেশকে প্রিয় ও প্রার্থিত এবং গ্রাহ্য ও শ্রদ্ধেয় করে তোলার প্রণোদনা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছেন। এইগুণ তাঁদের মূল্যবোধেরই পরিচায়ক এবং এইটেই তাঁদের কবিতাকে মূল্যবান করে তোলার ক্ষেত্রে সুযোগ অবারিত করেছে। সানাউল হকে হয়তো সৈয়দ আলী আহসানের সম্ভাবনাময় গভীরতর উপলব্ধি, মণ্ডিতসংযম, সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ কারুরূপ, অনায়াস পরিপাক-কৌশল এবং মহত্তর অনুভূতি নেই, কিন্তু ঐ মূল্যবোধের সমগোত্রীয়তা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত ঐকান্তিক একাগ্রতা সানাউল হকের যোগ্যতাকেও অনেকখানি উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

আমার এই আলোচনায় সৈয়দ আলী আহসানের ক্ষেত্রে যেমন 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত'কে তেমনি সানাউল হকের বেলায় 'সূর্য অন্যতর'কে পর্যায়ক্রমে এঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেছি।

সানাউল হকের এ-পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হল যথাক্রমে 'নদী ও মানুষের কবিতা', 'সূর্য অন্যতর' এবং 'সম্ভবা অনন্যা'। এই তিন গ্রন্থের ক্রমান্বয় ধাপে চেতনাগত দিক থেকে তাঁর কোন বিবর্তন হয়নি, তবে 'সূর্য অন্যতরে' তুলনাগতভাবে ভাবপ্রকাশে অধিকতর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা ভিত্তিগত শিথিলতা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় নি। রোমান্টিক আস্বাদন-উন্মুখতা তাঁর মৌলিক প্রবণতা, এজন্যে বিষয়-সৌন্দর্যের আবেদন তাঁর কাছে অনিবার্য। বিচিত্র সৌন্দর্য-কোণগুলো অবিশ্রান্তরূপে তিনি শব্দের আঁচড়ে বাঁধতে চান বটে, কিন্তু কোথাও একটা দৈন্য আছে তাঁর অভ্যন্তরে যা ওগুলোকে কমনীয় ও সুকুমার স্বরূপে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠায় স্থাপিত করতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সর্বত্রই। এই দৈন্যের কারণ হয়তো অবিশ্রান্ত দ্রুততা, হয়তো মুহুর্মুহু আত্মপ্রকাশ, হয়তো রূপসমাবেশের নির্বিচার আধিক্য। দ্রৌপদীর শাড়ীর মত তাঁর পর্যবেক্ষণ যেন ফুরোতেই চায় না। এতে অনেক চিত্রকল্পের সমাহারই তাঁর নিজস্ব লক্ষ্য ও প্রণোদনা ছাড়িয়ে উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, স্তূপাকার পুঞ্জীভূত এই ছবির দঙ্গল স্থূল শরীরে ভারাক্রান্ত হয়ে উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতাকেই আবৃত আবিল

করে তোলে। ফলে এরা যেন কিছু বলবেওনা অথচ সরবেওনা—এমন পরিস্থিতিও তাঁর মধ্যে খুব দুর্লভ থাকে নি। এর সঙ্গে রয়েছে ছন্দগঠনের অস্বাচ্ছন্দ্য। যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য রূপসংযোজন এবং ভাষার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বিধান, তবুও অনেক ক্ষেত্রেই বহু ঝকমকে শব্দ যেন যতি ও মাত্রার নিয়মরক্ষার দায় সেরেই নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাতে ছন্দ-নিয়মের ও সুখী মিল-প্রয়োগের শেষরক্ষা সর্বত্র হয়ে ওঠে নি। যদিও সানাউল হকের মেধা খুবই সজীব, স্মৃতি ও অবলোকন শক্তি খুবই সক্রিয়, শব্দ ও দৃশ্য সম্ভারও সমৃদ্ধ, কোথাওবা অভিজ্ঞতার সীমিত পাড় ছিঁড়ে নতুন দিগন্তও দেখা দিয়েছে, কিন্তু অত প্রাচুর্যকে অমন করে ঠাসলে বোধ করি শিল্পরসটাই তিক্ত হয়ে ওঠে। কাব্য-উৎকর্ষের বুনোটটা এই পন্থায় সম্ভবতঃ খুব বেশী খোলে না। সানাউল হকের আবেগ যেন পরিণতিমুখী নয়, সম্পূর্ণ নিজের বশেও নয়—কেমন যেন একটানা, উদ্বাহু। ঊর্ধ্বগতি স্বতঃপ্রবাহেই উল্লসিত। প্রেক্ষিতটার সঙ্গে ন্যূনতম যোগ রাখে, এইমাত্র যা! তাছাড়া মনে হয়, সানাউল হক যেন অতিরিক্ত প্রবহমান হওয়াকেই আর্ট বলে মনে করেন, উজ্জীবনের সার্থকতা বলে অনুভব করেন। এই অশাসিত অনর্গল স্রোতবহতা সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করে কিনা, সানাউল হকের মধ্যে তার উত্তর রয়েছে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ আতিশয্য, অসংযম, অপরিচ্ছন্নতা ও অকারণ সর্বসংলগ্নতা এবং ছন্দ ও মিলের ক্ষেত্রে অমনোযোগ অসর্তকতা এবং পরিশ্রমবিমুখতাই কবি সানাউল হকের পক্ষে সুকবি হয়ে ওঠার সম্ভাব্যতায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বলে ধারণা হয়। এই 'যা আছে তাই' আহরণের কলেবর-বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রেই সানাউল হকের নিজস্ব উদ্বোধনের অনিবার্যতাকে নষ্ট করেছে। মাঝে মাঝেই মনে হয় না যে, কবি কোন অবধারিত ও অপরিহার্য আত্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, নিজস্ব বিশেষ বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর একাত্ম মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়েছেন—সার্থক ও সৎ কবিতার জন্যে যা একান্তই অপ্রতিরোধ্য ও অবিভাজ্য চাহিদা।

আমার এই সেন্সরের সপক্ষে সানাউল হকের অনেক পুরো কবিতাই উদ্ধৃত করা সম্ভব। বিশেষ করে 'নদী ও মানুষের কবিতা'য় উপরোক্ত বিশৃঙ্খলা আগাগোড়া অত্যধিক এবং আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, 'সম্ভবা অনন্যা' সনেটগ্রন্থ হিসেবে নির্ধারিত আঙ্গিকে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ

দোষমুক্ত নয়। এমন কি সনেটগুলোও তাঁর লিরিকাল উদ্বায়ুগতির বাহনমাত্র —এদের অধিকাংশেরই স্বয়ংসম্পূর্ণতা নেই, বিষয়ের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই, খণ্ডখণ্ড সনেট-আঙ্গিকে একই সুরের, একই কথার মালা গাঁথা। একাকার প্রতিফলনে সবগুলোই অবিচ্ছিন্ন। তবে 'সূর্য অন্যতরে' একই পুনরাবৃত্তির ঢল থাকলেও বয়োবৃদ্ধি অবিরাম অনুশীলনের ফলশ্রুতিস্বরূপ রচনা-দক্ষতার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা গেল :

(১) রোমহর্ষ তেমন তোমার হত যদি
অন্ধকারে একা ঘরে বুকে চেপে ধরে
নামতার ছড়া প্রেমে হৃদয় অবধি
ঢেলে দিয়ে ভাবতে থাকে, কষ্ট ভরে
মন, ফুল্লদেহে কেন ছায়া কালো মেঘ।
বিদ্যুতের কথা পাও যদি একবার—
ভয় ব্যাহত বেড়াল, ইঁদুরে আবেগ
লুটে নিতে পারে জানো রক্ষিত ভাঁড়ার।

(—'সম্ভবা অনন্যা')

(২) উঁচু থেকে নেমে-আসা শিলঙ-পাহাড়ে
জটিলা-কুটিলা বাঁক—তুমি আমি আর
এক মহাশয় বিবি। সুগন্ধী পাতার
পাইনে হাওয়া চুলবুল। জিজ্ঞাসার
চিড় : কোথায় লাবণ্য-অমিত দুর্ঘট
মোড়ে মুখোমুখী? হাসি, সেতো কাব্যকথা,
ঘটে নাই, উল্টোরথী ঘটনা প্রকট
বুলেটের সমাচারে আংশিক পূর্ণতা।

(—'সম্ভবা অনন্যা')

(৩) আকস্মিক কৃষ্ণপক্ষ : আসে অন্য কেহ
অন্ধকারে মনে হয় তুমি নেই আর।
তারপর কল্পনার মেলে অবকাশ :

তুমি আর আমি এক হয়ে ঘুচাই সন্দেহ।
আকাশে উড়ায় ছিল যত মানা যার,
আমরা আকাশ হলে নেতিবৃদ্ধ ঘাস।

(—'সম্ভবা অনন্যা')

(৪) হাভাতে গ্রামের ছবি, তুমি তিথিব্রতা
বিদিশা ঘরের কান্না—কী নিই শপথ
দুর্ভাগা দুর্ভোগ বিচ্ছু, ফিরে পিছু পিছু।
মোহনায় শুনলাম আহ্বান ত্রিস্রোতা
কান্নাবাষ্পভরা : জেগে জেগে ঢুঁড়ি পথ
জ্যোতির্লক্ষ্মী আভা কারো পাইয়াছি কিছু।

(—'সম্ভবা অনন্যা')

(৫) অন্ধকার : রাত্রির বেড়াল কালো
পেঁচার সারথী। অতঃপর যদি
ঘুমন্ত পৃথিবী ফুরফুর পাখি,
এবং অন্বিষ্টসুপর্ণা : হাড়ের আঁশের উপত্যকা
কে দেয় রাঙিয়ে বার্ণিশে জেল্লায়—
সে কি সূর্য-রঙ্-কারিগর,
চর-চোর জুয়াখোর কী অসত্য কুৎসিত—
অভিজিৎ একজন,
সেকি অন্যতর ভোরের প্রতীক?

অধিকতর দৃষ্টান্ত বাহুল্য মাত্র। উদ্ধৃতিসমূহের সতর্ক পাঠ এবং চিহ্ন-নির্দেশ সম্ভবতঃ অপরিশীলিত শব্দ, বাক্যাংশ ও উক্তি এবং গঠনশৈথিল্য ও ছন্দের এবং মিলের অস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কিত উপরোক্ত অভিযোগকেই স্পষ্ট করে তুলবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সানাউল হক বহু শব্দের কয়েনেজও করেছেন। কিন্তু সে সব প্রায়শঃই সুখপ্রদ তো হয়ইনি, বরং তা তাড়াহুড়োর স্বেচ্ছাচারিতায় এক ক্ষেত্রে কোন রকমে দায় সেরে ফুরিয়ে বা হারিয়ে যাওয়ার আগে আরেক চিত্র বা কথা ফুটানোর প্রবণতাকেই প্রকট করে তুলেছে। শেষ উদ্ধৃতিতে দুরূহতা নয়, বরং একথাই অনুমান হয় যে, কবি বক্তব্য

ও কল্পনায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও বিন্যস্ত না হয়েই তাঁর চিন্তার সূত্রকে কথার মধ্যে ঠেসে দিতে চেয়েছেন। এবং ফলে শিথিল উপমা ও উক্তি এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে গেছে। কবি অবশ্য দ্যোতনা ও উল্লেখের প্রথাবদ্ধ কারিগরি-স্পর্শ লাগিয়ে হয়তো পাঠকের অন্তরঙ্গ সংবেদনার উপর সৌজন্যমূলক শেষ আশা করেছেন। কিন্তু কবিতার যে দ্যোতনা বাঞ্ময় হয় তা দুরূহ হলেও শুধুমাত্র যে সুগ্রথিত থাকে তাই নয়, এ আভাস ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টির দায়িত্বও সঙ্গে সঙ্গে বহন করে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে দায়িত্ব পরিহার করেই যে কবির পরিশ্রমকাতর ভাববিলাস আত্মপ্রকাশের দায় সেরে গেছে, তা বুঝতে হয়তো খুব কষ্ট হয় না। মূলতঃ এসব কারণেই সানাউল হকের অকৃপণ পরিবেশনায় এত ছবি পার হয়েও মনে হয় যেন চিত্রের আঁকিবুকি খসড়া দেখছি, এত প্রগল্‌ভতার পরেও মনে হয় যেন এক কথা এবং বারবার শোনা কথাই শুনছি। মানসিক উদ্ব্যস্ততায় বিচিত্র সঞ্চরণে তিনি হয়তো ক্রমোন্নতি চেয়েছেন, কিন্তু গতি সঞ্চারিত হয়নি তাতে। কেননা তাঁর বোধে প্রগতি সম্পৃক্ত হলেও তাঁর উদ্ভাবনায়, তাঁর বক্তব্যে প্রগতি সঞ্জীবিত হতে পারে নি। ফলে সামান্য উত্তেজনায় তিনি অনেকদূর পরিভ্রমণ করেছেন সত্য, কিন্তু তার পরিণতি বৃত্তায়নেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছে অবশেষে। পরিপাকে নয়, শুধু পরিগ্রহণেই মাত্র তিনি অতিরিক্ত শক্তি ক্ষয় করেছেন বলেই হয়তো তাঁর আত্মগঠন ও উদ্‌ঘাটনে, অভিপ্রায় ও প্রতিফলনে, উপাদান ও উদ্‌ভাবনায় এই সঙ্কট, এই অসামঞ্জস্য। ফলে তাঁর অনুপ্রাণিত উল্লাস সামান্য কথনে, উদ্বুদ্ধ দৃষ্টি তুচ্ছ দর্শনে বহুবার পর্যবসিত হয়েছে; এই সম্ভাব্যতা ও স্খলনের আপাতঃবিরোধী দৃষ্টান্তও বহুক্ষেত্রে পাশাপাশি মুখ উঁচিয়ে রয়েছে। তাই একই সঙ্গে তিনি হাল্কা ও সিরিয়াস, বিদগ্ধ ও অসজাগ, অপরিশীলিত।

সানাউল হকের মজ্জাগত ন্যারেটিভ-প্রবণতাই হয়তো সঙ্কটের মূল কারণ। আধুনিক কবিতা মিতস্বভাবী, কিন্তু বহুভাষী; বিচ্ছুরণশীলতাই এর প্রকৃত স্বভাব, সে কারণে এর রূপায়ণমূলকতা বিষয় ও বস্তুর কাঠামো ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিরপেক্ষ। এক আভাষময় সুবহ অন্তঃস্রোতের মাধ্যমে এর উপজীব্যের পূর্বাপর এ বিধৃত করে। সানাউল হকের বস্তুনিষ্ঠ ন্যারেটিভ-উচ্ছলতা তাঁর অনুসৃত আধুনিক প্রকরণে বিরোধ সৃষ্টি করবে স্বাভাবিক-

ভাবেই। তাই মনে হয়, সানাউল হকের প্রবণতা ও সচেতনতায় সুসম সমন্বয় সাধিত হয়নি। তাঁর অন্তরপটের এই অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে তাঁর অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ হিসেবে বহুতর সংস্থা ও কাল-জড়িত প্রবণতার উত্তরাধিকারী একজন হতে পারেন, কিন্তু সচেতন শিল্পীকে নিজের অন্বিষ্ট-অনুকূল মার্জনায় সংগঠিত হতেই হয় এবং তাই হয় তাঁর পক্ষে সুচারু বিকাশের সবচেয়ে উপযোগী ভিত্তিপট।

আর একটি কথা: আধুনিক কবিতার আঙ্গিককলার বহুবিধ উৎকর্ষ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম, তাৎপর্যময় এবং ইফেক্‌টিভ মাধ্যমসমূহ তাঁর কাব্যের গঠন-কৌশলে তিনি তেমন কাজে লাগান নি। তিনি শুধু আধুনিক এটিচ্যুড ও সাম্প্রতিক শব্দব্যবহারধারা ও ভংগীবিশেষের সঙ্গে সংযোজিত হতে চেয়েছেন মাত্র। সে কারণে তিনি যেন অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কতকটা আত্ম-মুখ্য স্বাভাবিকতায় উৎসারিত। এই মনোভাব চারণস্বভাব-পরিশ্রুত কিনা এবং স্যারেটিভ-প্রবণতার যোগসূত্রও এখানেই রয়েছে কিনা তা বিচারসাপেক্ষ।

মোট কথা, কিছুটা সহজাত তথা দেশজ উত্তরাধিকার, কিছুটা অনুক্রমিক ত্রুটির সঙ্গে কিছুটা সচেতন ব্যাপকতর গ্রহণের ফলে অর্জিত আধুনিক ব্যাপ্ত বোধের সমন্বয়ে সংগঠিত সানাউল হকের মানস। এ ক্ষেত্রে তাঁর সদ্‌গুণসমূহ প্রতিশ্রুতিময়, কেননা তাঁর আত্মসংগঠনের এবং সুসমঞ্জস বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কোন অক্ষমতা ও বদ্ধমূলকতার পরিচয় তিনি দেন নি যা তাঁর ভবিষ্যতকে ছায়াচ্ছন্ন করে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। স্ববিরোধীতার সংশোধন তাঁকে শিল্পসম্মতির পথ দেখাতে পারে বলে মনে হয়।

॥ ২ ॥

তালিম হোসেন এবং সিকান্‌দার আবু জাফর নজরুলের কাব্যাদর্শ থেকেই প্রেরণা পেয়েছেন। তালিম হোসেন নজরুলের মুসলিম চেতনা-মূলক কাব্যের অনুসারী, সিকান্‌দার আবু জাফর নজরুলের সমাজ-সচেতন সংগ্রামী ধারাতেই তাঁর কাব্যের মূল সুর খুঁজে পেয়েছেন। এঁদের দু'জনেরই কবি-জীবনের সূত্রপাত চল্লিশের দশকে।

এ পর্যন্ত তালিম হেসেনের দুটো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটির নাম 'দিশারী' এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি 'শাহীন'।

'দিশারী' মুসলিম পুনর্জাগরণের চারণ-গ্রন্থ। স্বাধীনতা ও হৃতচেতনা অর্জনের উদ্বোধনী সুরে এই গ্রন্থ ধ্বনিময় কবিতা ও গানে। চিন্তা ও আদর্শ, বক্তব্য ও ইংগিত অত্যন্ত নির্ধারিত ও সুসংস্থাপিত বলে কবিতাগুলোর ভাষা সাবলীল এবং ছন্দও নির্বাধ, স্বচ্ছন্দ। নতুন কোন উদ্‌ভাবনা, কি কল্পনা, কি বক্তব্যের সংযোজনার অবকাশ হয়তো এতে নেই বলেই, কবির সে রকম কোন প্রয়াসও এতে লক্ষ্য করা যায় না। তিনি নকীবের ভূমিকা পালন করেছেন অর্পিত দায়িত্বে, বাঞ্ছিত কর্তব্যের সাড়ায় মাত্র। অথচ ফররুখ আহমদের সক্রিয়তার স্বরূপ ও আদর্শবোধ একই হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষেত্রে এমন ঘটেনি। এই আদর্শই ফররুখ আহমদের বেলায় তাঁর নিজের উদ্‌ভাবিত আদর্শে পরিণত হয়েছিল, তাঁর মনেই যেন এর জন্ম এবং একে বর্ধিত ও জীবন্ত করার জন্যে নিজের আহৃত ও উপলব্ধ উপাদানেই একে তিনি সজ্জিত করে তুলেছেন। প্রত্যেক আদর্শই কোন যথার্থ কবিকে উদ্বুদ্ধ করলে তা প্রথমতঃ কবির নিজস্ব বিষয়ে পরিণত হয়েই রূপায়িত হয় এবং পরে তা বিবিক্তস্বরূপে সর্বজনীন হয়ে তার নিজস্ব পূর্বান্বিত তাৎপর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। সার্থক কবিতার জন্মলাভের এই হল বিচিত্র ও উজ্জীবিত, আত্মনির্ধারিত ও উদ্বুদ্ধ, খেয়ালী ও উচ্চমন্য উপায়। এর কারণ এই যে, কবিকে অন্ততঃ সৃজনমুহূর্তে মৌলিক হতেই হবে; কবি তাঁর উদ্‌ভাবনায় কোন শরিক মানতে পারেন না, এবং কোন হাত ফেরতা উপকরণ ব্যবহারেও তাঁর প্রকৃত সিদ্ধি আসতে পারে না। সেজন্যেই কবিতার মিমেসিজমে কেবলই কবির পক্ষ থেকে আত্মায়ন করা হয়, সকল শোষণেই কেবলই নিজের মনের রঙ লাগানো হয়। ফররুখ আহমদ এই প্রস্তুতিগত প্রশাসনে আত্মস্বাক্ষর সর্বত্র চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তালিম হোসেনে অবশ্য সে চড়াই দেখা যায়নি, অন্ততঃ 'দিশারী'তে। তিনি বরং আরবী-ফারসী শব্দসমূহ ফররুখ আহমদের ঢঙে ব্যবহার করে এ-ক্ষেত্রে কিছুটা মেজাজী সজীবতা আনতে চেয়েছেন মাত্র। ফররুখ আহমদ প্রতীক ও চিত্রের রূপকল্প জগত আবিষ্কার করেছিলেন যেখানে তাঁর আত্ম-স্বপ্নের রঙ লেগেছিল। তালিম হোসেনে তা নেই। বরং তালিম হোসেন অগ্রসরমানতা বোঝাতে

কাফেলা, দুস্তর যাত্রা বোঝাতে মরুভূমি ইত্যাদি প্রথাবদ্ধ রূপক অত্যন্ত চর্চিত ও মামুলি পদ্ধতিতে ব্যবহার করেই দায় সেরেছেন। ফলে, তাঁর রচনা পদ্য হলেও কাব্যের বোল কমই বেজেছে তাঁর হাতে। 'দিশারী' গ্রন্থের কবিতাগুলোর শিরোনামার দিকে তাকালেও এই উক্তি অনেকাংশে গ্রাহ্য বলে মনে হবে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শাহীন'-এ বরঞ্চ তালিম হোসেন কিছু কবিসুলভ আচরণের পরিচয় দিতে পেরেছেন। তাঁর ব্যক্তি-অনুভূতির প্রকাশ দেখি এ-গ্রন্থে। নিজস্ব বিচার, প্রশ্ন, প্রতিক্রিয়া ও উপলব্ধি আত্মিক-স্পন্দনে এই গ্রন্থের কিছু কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। এমনকি "মমীর প্রশ্ন" কবিতাটি তাঁর সেই প্রবর্তনার বিষয়—সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও এতে তাঁর নিজেরই উদ্‌ভাবনা ও মানসব্যঞ্জনা সঞ্জীবিত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে এইটে তাঁর সফল কবিতাগুলোর একটি।

'শাহীন'-এ কয়েকটি সনেটও রয়েছে। ব্যক্তিক এবং আদর্শ ও ঐতিহ্যিক চেতনামিশ্রিত আরো কিছু সফল কবিতা এই গ্রন্থে আছে; এবং সাম্প্রতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে লেখা কিছু কবিতাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই থেকে এমন ধারণা করা যায় যে, তালিম হোসেন পূর্বতন আদর্শ-ভিত্তিক বদ্ধমূলকতায় চারণ-নিষ্ঠার সার্বিক ও অন্ধ-আবদ্ধতা কাটিয়ে তাঁর চেতনার পরিধিকে বাড়াতে শুরু করেছেন এবং কবি-মনের স্বাধীন স্বেচ্ছাবিহারের দাবীকে বুঝেছেন। এ তাঁর পূর্বতন আদর্শবোধ থেকে সরে আসা নয়। বরং এই ভিত্তিতেই ব্যাপকতর ও সাবালক উদ্বোধনেরই লক্ষণ এইটে।

সিকান্দার আবু জাফরের কাব্য-গ্রন্থ 'বৈরী বৃষ্টি'তে প্রথম কবিতার শেষ স্তবকটি হল:

ধ্বংসের রাহু পেয়েছে রাজ্যভার।
বিশ্ব মানবতার
দিক্ দিগন্তে একি ক্ষমাহীন অকুণ্ঠ ব্যভিচার?
স্তব্ধ কৌতূহলে

অতীত যুগের পাতা ছিঁড়ে একে একে
ভাসাই তিক্ত বিস্মরণের জলে!

'সত্যের খুনে নিষিক্ত ধরাতল' সম্পর্কে এমন বিষাদাত্মক স্বগতোক্তি বাংলা কাব্যে নতুন নয়। 'অসম্মানের বীভৎস-ধৃত সুন্দর কল্যাণ' অবলোকন করে ব্যথাহত কবি-হৃদয়ের ক্ষোভ-স্পন্দনও বাঙালী কবিকণ্ঠে বিরল নয়। কিন্তু সিকান্দার আবু জাফরেরও এই বিদিত সত্যেরই ভাষ্যকার হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি বোধ করি এই যে, এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া তাঁর নিজের স্নায়ুরও অবিমিশ্র উপাদান এবং তাঁর জীবনকে আলোড়িত করেই এই সত্য ব্যক্তি-লগ্ন রসায়নে উত্থিত হয়েছে। সেজন্যেই 'দিক দিগন্তে' শুধু 'ব্যভিচারে'র উল্লেখেই তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন না। এর সঙ্গে যোজিত হয় নিজস্ব শিরার বিক্ষুব্ধ স্পন্দনজড়িত 'ক্ষমাহীন' ও 'অকুণ্ঠ' বিশেষণ দুটি এবং নিজের অবিভাজ্য-সংলগ্নতার ফলস্বরূপ ব্যক্তি-সক্রিয়তা অবশেষে অতীতের পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে 'বিস্মরণের জলে' ভাসিয়ে তবে স্বস্তি পায়, আপাততঃ সংক্ষোভ থেকে ক্ষণিক রেহাই খোঁজে। এই আত্মগত চেতনা ও সেই সঙ্গে বলিষ্ঠ সংলগ্নতার সুরই নজরুলের সমাজ-সচেতন ধারার কবি সিকান্দার আবু জাফরের স্বতন্ত্র বিশেষত্বের ভিত্তিকে চিহ্নিত করেছে। এই আত্মগত সুর নজরুলের প্রত্যক্ষ ও বিঘোষিত উপাদানগুলো-কেই কিছুটা শিল্পমণ্ডিত করার সুযোগ সিকান্দার আবু জাফরের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং তিনি কোন কোন কবিতায় তা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহারও করেছেন। কিন্তু এ-কথা তবু সত্য যে, সর্বত্র তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি এবং বহুক্ষেত্রে এর প্রয়োজনবোধ সম্পর্কেও তিনি নিদারুণ অনবহিতির পরিচয় দিয়েছেন। এই পর্যায়ে তিনি উচ্চকণ্ঠ, উপাদান-ব্যবহারে নির্বিচার, কাব্যের শিল্পসত্তা সম্পর্কে একেবারেই লাপরোয়া, তোয়াক্কাহীন।

তাঁর সফল উৎসারণের উদাহরণ যদি উপরে উদ্ধৃত স্তবকটিকে গণ্য করা যায়, তাঁর স্খলনের চূড়ান্ত নিদর্শন বোধ করি:

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে
চাউল এসেছে ঘরে

তেল নূন চিনি অনেক এসেছে আরো
দুধ মাছ আর খাসীর মাংস
এনেছি যোগাড় ক'রে।
সারাটা সকাল তোমার জননী
রান্নায় মশগুল।

(—এখন তুমি ঘুমাও, 'সমকাল')

বা,

বাপজান—
ঈদের সালাম নিও, দোয়া কোরো, আগামী বছরের
কাটিয়ে উঠতে পারি যেন এই তিক্ত বছরের
সমস্ত ব্যর্থতা।
অন্ততঃ ঈদের দিনে সাদাসিধে লুঙ্গি একখানি,
একটি পাঞ্জাবী আর সাদা গোল টুপী
তোমাকে পাঠাতে যেন পারি ;
আর দিতে পারি পাঁচটি নগদ টাকা।
এইটুকু পেলে—
দশজন পড়শীর মাঝে
পুত্রের কৃতিত্ব ভেবে দুটি অন্ধ চোখে
হয়তো আসবে ফিরে দৃষ্টির সান্ত্বনা।

(—ঈদের চিঠি)

প্রভৃতি স্তবকগুলো। অনেক ক্ষেত্রেই সিকান্দার আবু জাফর গদ্য ও পদ্য উপাদানের পার্থক্য সম্পর্কে অসচেতন। উদ্দিষ্ট জীবন ধারণা এবং পাঠকের মনে সেই ধারণা সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে কবিতাকে ব্যবহার করার প্রবল অভিপ্রায়ই তাঁকে অধিকতর উত্তেজিত রেখেছে। এ-তাঁর মূলবোধ ও কাব্য লেখার প্রেরণা। কবিতার স্থিতধি, তিলতিল উপার্জন ও প্রতিফলনের গুরুত্ববোধ থেকে তিনি স্খলিত হয়েছেন তাই বারবার। এই একই কারণে সিকান্দার আবু জাফরের ছন্দও অনেক ক্ষেত্রেই গদ্যধর্মী, তাঁর ব্যবহৃত অধিকাংশ বিষয়েরই মত। বস্তুতঃ গণঅভিলাষ-রূপায়ণ ক্ষেত্রেও কবি এজেন্ট মাত্র হতে পারেন না, এ ক্ষেত্রেও তাকে সোর্সই হতে হয়। কেননা

কবি ক্রিয়েটর, প্রয়োগশালার ক্রিয়েটর এজেণ্ট হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু শিল্পবুদ্ধি এই ত্রুটি ক্ষমা করে না। তাই কাব্যের কাব্যগুণ, শিল্পের শিল্পকলা অপরিহার্য।

সিকান্দার আবু জাফর বক্তব্যে স্পষ্টভাষী এবং মেজাজে বলিষ্ঠ হওয়ার পক্ষপাতী। তাঁর প্রেমের কবিতাতেও এই ধাচ স্পষ্ট। একটি মাত্র উদাহরণ দিই :

তাকাতেই দেখি নাগালের গণ্ডীতে
ইঙ্গিত আঁকা অমৃত-কুম্ভ
তুমিই প্রথমে মেলেছো আমন্ত্রণ।
মুহূর্তে তুমি প্রিয়া,
এবং তোমাকে আত্মদানের তখুনি উদ্দামতা।
এই অবশ্য-প্রার্থিত তুমি
আর কেউ হতে পারত
যে কেউ হতে পারত কি ?
হয়ত বা ;
অন্ততঃ আমি নিঃসন্দেহ নেই।

কাব্যসিদ্ধির কথা বাদ দিলেও এই ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য কাব্য-বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে। তাছাড়া সিকান্দার আবু জাফর সজীব কবি এবং চল্লিশের দশকে কবিতা লিখতে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি সৃজনশীলতায় অব্যাহত রয়েছেন, বিশেষ করে সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে কেবলমাত্র বিষয়ে নয়, আঙ্গিকের পরিবর্তনের সাহায্যেও তিনি যোগস্থাপনে সচেষ্ট।

স্বাধীনতার পরে পরেই যে সকল কবি পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন আশরাফ সিদ্দিকী, সৈয়দ আলী আশরাফ ও আবদুর রশীদ খান প্রমুখ। আশরাফ সিদ্দিকীতে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু তিনি কেবলই প্রগ্‌লভ রয়ে গেলেন, স্থিতধি হলেন না। বিশেষ করে বহু কবির প্রভাব-ছাপ তাঁর কবিতায়। অবশ্য সব সফল কবিই আত্মগঠনে অন্যের হাতের দাগগুলো অবশেষে মুছেই ফেলেন।

॥ ৩ ॥

১৯৫০ সালের পর আমাদের কাব্যপ্রয়াসে পালাবদলের কাল। ১৯৫০ সালে প্রকশিত 'নতুন কবিতা' নামক কতিপয় তরুণ কবির যৌথ কাব্যসংগ্রহ এই নতুন সুরের দিক-চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা না গেলেও, এই সঙ্কলনের কয়েকজন কবিই যে পরবর্তী সময়ের প্রধান কাব্যধারা নির্মাণে পুরোধার দায়িত্ব পালন করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পূর্ব বাংলার কাব্যের সাম্প্রতিক সুরটির ব্যাপ্তিকাল ১৯৫০-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত এবং এর পটভূমিতে যে কাব্য-আন্দোলনের প্রেরণাশীল প্রভাব রয়েছে, তারও পরিধি জীবনানন্দ দাশ থেকে ত্রিশের কবিদল অতিক্রম করে সাম্প্রতিকতম আন্তর্জাতিক তরুণ কবিগোষ্ঠীর কাব্য-আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পটভূমিতে আমাদের পঞ্চম দশকের কবিদলের ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, ১৯৫০-এর পরে আমাদের কাব্যের পালাবদলের স্বরূপটা কি? এই স্বরূপ পরিগ্রহণ কি দ্রুত সংঘটিত হয়েছে, না আজ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তা আত্মগঠনে লিপ্ত? এই পালাবদলে পূর্ব বাংলার কবিতা কি নির্দিষ্ট নতুন কলেবর লাভ করেছে, না, তা স্থিতাশ্রয়ী না হয়ে বিভিন্নরূপে খণ্ডিত এবং আত্মস্থ না হয়ে রূপান্তরের বহুধা সংক্ষোভে আবর্তিত?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে এই কাব্য-পটভূমির বৈশিষ্ট্যের পরিচয়টি হৃদয়ঙ্গম করা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

প্রতীক-শ্রী সজ্জিত ব্যঞ্জনাময় রোমান্টিক ভাষায় লীলায়িত ত্রিশের কবিতার প্রধান সুর যুগের সত্যকে আবিষ্কারের মধ্যে বিধৃত। এই উদ্দীপ্ত আবিষ্কার-অভিযানে কবির নিজস্ব রুচি, অভিব্যক্তি-ভংগী, আত্মগত অভিজ্ঞান এবং স্বকীয় কল্পনাপ্রকর্ষ ও চিত্রময় উদ্ভাবণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য—সবই রয়েছে, কিন্তু সকল বৈচিত্র্য-বিচ্ছুরণ সত্ত্বেও এ-কালের কবিতার লক্ষ্য এক। লক্ষ্য ঐ যুগের স্বরূপ। যেন সকল নদী একই মোহনার দিকে ছুটেছে। ত্রিশের যুগে গীতি-কবিতা তার পূর্বতন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচিত্র-বিষয়মুখীতা (subjective)

থেকে সরে এসে অধিকতর বিশিষ্ট সর্বজনীন লক্ষ্যমুখী (objective) হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক বিষয়ের রূপকার হওয়া এ-যুগে সম্ভব নয় বলেই অন্তরঙ্গ লক্ষ্য, আদর্শ ও প্রবণতার উপর একে যে নির্ভর করতে হয়েছে এতে সন্দেহ নাই। সে যাই হোক, ফলশ্রুতিটা হয়েছে কিন্তু একই। কেননা এই মৌলিক প্রবৃত্তিগত উপাদানই ত্রিশের কবিতার স্বভাবধর্ম বদলিয়েছে। সময়ের স্বরূপ ও প্রবহমান সত্যকে আবিষ্কারের এই সার্বিক প্রয়াস ত্রিশের কবিতাকে অন্ততঃ আভ্যন্তরীণভাবে এক রূপায়ণমূলক স্বভাবের অধিকারী করে তুলেছে। এ জন্যে এ-যুগের কবিতাকে অনেকেই Neo-classical বলে অভিহিত করতে চান। এ-দাবী মূলতঃ সত্যনির্ভর। কেননা, ত্রিশের কবিতা চেহারায় রোমান্টিক হলেও, স্বভাবে ক্লাসিক। ফলে দেখা যাচ্ছে, কবিতার বিবর্তনে এক তাৎপর্যময় পুনরাবৃত্তির উচ্চকিত সুর। অর্থাৎ ত্রিশের যুগে আবার কাব্যে পরিবেশই প্রধান নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কবির স্থান চলে গেছে দ্বিতীয় স্তরে। এ-কথার প্রমাণ এই যে, ত্রিশের কবিতায় প্রধানতঃ যুগ-সত্য এবং সাময়িক স্থানকালপাত্রনির্ভর প্রকরণ কাব্য-বক্তব্য এবং উপলব্ধ অভীপ্সাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কবি তাঁর সমগ্র বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়েই অনিঃশেষ আহরণে ও উৎসরণের মধ্যে ঐ একক লক্ষ্যে নিজের সমস্ত সাধনাকে সমর্পিত করেছেন। ত্রিশের কবিতার ঐশ্বর্য্য ও কবিদের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবৈশিষ্ট্যের অন্তরালে যুগের শক্তির কাছে কবিদের ব্যক্তি-সত্তার যূথবদ্ধ আত্মসমর্পণের এই দৈন্য লুকিয়ে আছে। ত্রিশের যুগে রেনেসাঁর মূল্যবোধের পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি। সে-কারণে এক বিপর্যস্ত যুগে মানবতার দাবী কবিকে দিয়ে এক মহত্তর দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছে বলে মনে হয়। যে-কোন প্রেরণায় এই দাবী পালিত হলেও, আদতে কবি-মন এই দাবীকেই চিরন্তন ও যথার্থ বলে মেনে নিতে পারে কিনা, সে এক প্রশ্ন। ত্রিশের প্রভাব পার হওয়ার প্রস্তুতিতে বাংলা কবিতাতেও এ-প্রশ্নের উত্তর কিছুটা পাওয়া যেতে শুরু করেছে।

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে তরুণ কবিদের কাব্য-প্রয়াসে একটা আত্ম-কেন্দ্রিকতার সুর সব কিছুকে ছাড়িয়ে প্রধান হয়ে উঠছে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বব্যাপী কাব্য-আন্দোলনে এই প্রবণতারই এখন প্রাধান্য। আউটসাইডার, এ্যাংগ্রী ইয়ংম্যান, বিটনীক্স এবং চিকেন্সদের চিত্তপ্রকর্ষের মাধ্যমেই এই

নতুন কাব্য-বিভঙ্গ বুনিয়াদ লাভ করেছে এবং সেই ঢেউ এসে লেগেছে বাংলা কাব্যেও। অবশ্য বাংলা কাব্যে ১৯৬০-এর পর থেকেই এই নতুন স্বভাব পরিগ্রহণ স্পষ্ট ও সর্বাত্মক আধিপত্যে মূর্ত হয়ে উঠছে। একে ত্রিশের কবিতার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের দোলা বলে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্যই এ প্রতিক্রিয়াজাত। ত্রিশের যুগের কবির যুগীয় প্রবণতার একাধিপত্যই এই প্রতিক্রিয়ার উৎস। কিন্তু এর মূল লক্ষ্য হল গীতিকবির সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা কবিমনের স্বাধিকারকে ফিরে পাওয়া। প্রকৃতির লীলার মত এই বিবর্তন ক্ষেত্রের এক বিচিত্র রহস্যও এই যে, গীতিকবিতা রেনেসাঁর দান এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও তাই। রেনেসাঁ-উদ্ভূত মানবিকতার দাবীই ত্রিশের যুগে কবির স্বাধিকার-উদ্ভাবনার অধিকারকে পরোক্ষে অপহরণ করেছিল। আর ষাটের যুগে বাংলা কাব্যে সেই হৃত অধিকারকে ফিরে পাওয়ারই অভিসার চলছে। কিন্তু রহস্যের শেষ এখানেও নয় এজন্যে যে, রেনেসাঁর মূল্যবোধের জন্যেই ত্রিশের কবিকে নিজের ব্যক্তিবিচ্ছুরণ গৌণ করে যুগীয় সত্যের প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়েছিল, আর সম্প্রতি সেই ব্যক্তির প্রাধান্য অর্জনের সংগ্রামে রেনেসাঁর মূল্যবোধগুলোকেই বর্জন করে কবিকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। তদুপরি আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কালেই কবিকে আত্মকেন্দ্রিকতার পথ ধরতে হচ্ছে এবং এই স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্যে বিষয়বৈচিত্র্যের সন্ধানও তাঁরা পাচ্ছেন না। একই ধরনের বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও অনুভবের মধ্যে সবাই মিলে আবর্তিত হচ্ছেন। ত্রিশের কবিতার পটভূমি বিশাল দেশ ও কালগত; কিন্তু এর পটভূমি আত্মগত—ত্রিশের কবিতার প্রকৃতি রূপায়ণমূলক, কিন্তু এর প্রকৃতি ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়ামূলক। ফলে বিস্তীর্ণ ও সংকীর্ণের মধ্যে যে প্রভেদ তাই প্রকট হয়ে উঠেছে এই দুই বিভঙ্গের কাব্যের মধ্যে এবং কাজে-কাজেই রসগ্রাহিতার প্রশ্নেও এদের ভাগ্যে বিপরীত ফল জুটছে। ত্রিশের কবিতা মূল্যবোধে ধন্য। ষাটের কবিতা ক্লান্তিচর্চিত ও অনীহাচিহ্নিত।

এর কারণ বোধ করি এই যে, কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার মহতী লক্ষ্যে ত্রিশের কাব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে এই নতুন কাব্যধারা ত্রিশের কাব্যের মূল্যবোধগুলোর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে বসেছে। রেনেসাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যসজাগ এক মূল্যবান চেতনার পুনরুদ্ধার-সংগ্রামে

রেনেসাঁর মজ্জাগত মূল্যবোধ পরিহার করার দরুনই এই নতুন কাব্যধারার সাফল্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় সূচিত হয়েছে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ এই নতুন কাব্যধারা নতুন কোন মূল্যবোধ আবিষ্কার করতেও সমর্থ হয় নি। তাঁদের উদ্যমের অনুরণনের মূলে ব্যক্তি-স্বাধিকারের পুনরুজ্জীবন-অভিলাষ ছাড়া আর কিছু নেই। এই লক্ষ্যও অবশ্যই ভালো, যদি তা বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজের ভায়োলেণ্ট তরুণ-মানস এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, বৈদগ্ধ্য ও নীতিশর্তসমূহের প্রতিও বিদ্রোহ-উন্মাদনা জড়িত করে ঐ লক্ষ্যের বিশুদ্ধতা ও চেতনাগত সমৃদ্ধি-সম্ভাবনারও ভবিষ্যৎ অনেকাংশে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অবশ্যই এই নতুন ধারার ফলপ্রসূ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এর পূর্বশর্ত বোধকরি এই যে, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অকারণ ও অযৌক্তিক বিদ্রোহ পরিহার এবং সম্ভব হলে নতুন মূল্যবোধের আবিষ্কার। কিন্তু তা পরের কথা। ষাটের নব উদ্যমের আপাতঃ ফল এই যে, এ কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপরিহার্য আবশ্যকতার বিষয়টি ব্যক্ত করতে পেরেছে এবং কাব্যের নিরঙ্কুশ বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয় শর্তটি উপলব্ধও হতে শুরু করেছে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে।

আমার এই বক্তব্যে প্রথমেই জীবনানন্দ দাশকে ত্রিশের কাব্যসীমা থেকে বহির্ভূত করে উল্লেখ করতে চাই। কেননা, জীবনানন্দ দাশে আধুনিক চেতনার অনুপ্রবেশ এবং জীবন ও সমাজ সত্য-সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ সুপ্রচুর থাকা সত্ত্বেও, তাঁর কাব্যে কবির ব্যক্তি-মানসই প্রধান নিয়ামক শক্তি। তাঁর কাব্যে সমসাময়িক পরিবেশ ও সত্য-সংক্রান্ত অবলোকনশীলতা ত্রিশের কবিতার পূর্বসূরীর দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র। এলিয়ট-অডেন প্রভাবিত যুগচেতন কাব্যের প্রাকমুহূর্তের কবি ইয়েটসের ভূমিকার সঙ্গে এদিক দিয়ে জীবনানন্দের তুলনা চলে। কিন্তু ইয়েটস ও জীবনানন্দ—এই দুই কবির উভয়ের কাব্য-ক্ষেত্রেই, যুগসত্য নয়, কবিমানসই প্রধান প্রতিপাদ্য উপাদান। এই দু'জনের মধ্যেই রোমান্টিক খণ্ড-বিষয় আস্বাদন এবং আপাততঃসম্পূর্ণ খণ্ডিত উপকরণ-নির্ভর উজ্জীবন যেমন রয়েছে, তেমনি লক্ষণীয় এঁদের নিজস্ব জীবনদর্শন, একান্ত ব্যক্তিক-বক্তব্য এবং আত্মনির্ভর উপলব্ধি, গ্রহণ ও উত্তেজনার সুস্পষ্ট, সর্বপ্লাবী উদ্ভাসন। ষাটের কবিতাতেও এই ব্যক্তিচেতনাই

পুনঃপ্রতিষ্ঠা-উদ্‌গ্রীব। কিন্তু উভয় স্তরের ব্যক্তিচেতনার পার্থক্য এই যে, প্রথমটি রোমান্টিক কাব্যের বিবর্তনধারায় স্বাভাবিক ও সহজাত এবং দ্বিতীয়টি ত্রিশের কবিতার যুগ-প্রাধান্যের প্রতিক্রিয়াজাত। প্রথমটির প্রতি ক্ষেত্রেই কবির ব্যক্তিমন নিজস্ব অভিজ্ঞান-উদ্বুদ্ধ, স্বতন্ত্র মনোভংগী ও উপলব্ধিতে উচ্চকিত। আর দ্বিতীয়টির প্রায় সর্বত্রই ব্যক্তি-স্বাধিকারের অবাধ পটে বিষয়, উপলব্ধি, বক্তব্য ও মনোভংগীর একাকারিত্ব। প্রথম স্তরের ব্যক্তি-চেতনা আত্মস্থ ও সুগঠিত উপাদানে স্বাভাবিক বিবর্তনধারায় রেঁনেসার মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, দ্বিতীয় স্তরে দেখি মূল্যবোধের অভাব এবং ব্যক্তিক স্বেচ্ছাচারিতার একই চেহারা ও মেজাজের দায়িত্বহীন বিস্ফোরণ। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ব্যক্তি-চেতনার উদ্বোধন প্রতিক্রিয়াজাত বলে কাব্য-ক্ষেত্রে এর স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে একে সহজাত-সংস্থিতির অপরিহার্য দাবীটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয়। বিশেষ সতর্কতার জন্যে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন এই যে, ত্রিশের কবিদের যে ব্যক্তিচেতনা নেই, তা নয়। কিন্তু তা যুগচেতনার রূপায়ণে উৎসর্গীকৃত। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ত্রিশের কবিদের ব্যক্তিত্বের ঋজুতা তাঁদের কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্যের নামান্তর নয়!

জীবনানন্দ, ত্রিশের কবিতা এবং সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনের উত্থান-পতনমুখর এই বিচিত্র কালসীমাই আমাদের পঞ্চাশ-পরবর্তী কাব্য-প্রয়াসের পটভূমি। এই সময়-পরিধিতে আমাদের কাব্যসাহিত্যে অন্ততঃ একজন কবি উপরোক্ত পটভূমির সারাৎসারকে সার্থকভাবে আত্মস্থ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শামসুর রাহমান। সম্ভবতঃ পঞ্চাশ-পরবর্তী সমগ্র বাংলা কাব্যেই তাঁর এই সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখিত হওয়ার দাবী রাখে। জীবনানন্দের আত্মসচেতন এবং নিজস্ব উদ্ভাবন ও দর্শনসঞ্জাত কবিতাই শামসুর রাহমানের কাব্যের প্রথম এবং মৌলিক প্রেরণা। এই উৎসমুখ থেকে তিনি নিজস্ব পরিণতির পথে অত্যন্ত সচেতন ও সজাগ, সতর্ক ও সর্বভূক মুক্তদৃষ্টি নিয়ে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। এই পরিক্রমায় যেমন তাঁকে ত্রিশের যুগ-চেতনার সঙ্গে আত্মস্থ হতে হয়েছে, তেমনি অতি-সাম্প্রতিক কালের প্রতিক্রিয়াজাত ব্যক্তি-স্বাধিকারবোধ-উচ্চকিত তৎপরতার

সঙ্গেও তাঁর মানসযোগ ঘটেছে অনেকাংশেই অনায়াসে, সহজাতরূপে! যেহেতু জীবনানন্দের সমগোত্রীয় রোমান্টিক ব্যক্তি-বোধের স্বেচ্ছা-উদ্বোধনই তাঁর সহজাত মানসপ্রকৃতি, সে কারণে ত্রিশের অন্তঃপ্রেরণা-প্রভাবিত যুগসত্য-রূপায়ণের ক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও আত্মসম্পৃক্তি এবং ব্যক্তিক রুচি, দর্শন ও আসক্তির সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থেকেই সময়ের দাবী মেটাতে চেয়েছেন। অন্য-পক্ষে অতি-সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়াজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ-মূলক তৎপরতার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর কবিতায় লক্ষণীয় যে, এই অন্তর্গূঢ় বহিঃপ্রকাশের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সজাগ, কিন্তু সেই সঙ্গে এর স্বেচ্ছাচারী বিস্ফোরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কও! সেজন্যে এই নতুন আলোড়নের আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিকারের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বরং তিনি বিতর্কের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির স্বাধিকার-সঞ্চয়নের যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য প্রতিফলিত করেছেন তাঁর কাব্যে এবং প্রতিরোধী ও প্রতিবাদী শক্তি সম্পর্কে বিরূপ-বিরস ক্ষুব্ধকণ্ঠে মুখর হয়ে উঠেছেন। এই বিতর্ক, বিরূপতা ও সমর্থনই অতি-সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সংযোগের সাক্ষ্য। কিন্তু প্রকৃতরূপে বিচার করলে তাঁর এই মনোভাবকে অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ও নতুন বলে অভিহিত করা যায় না। কেননা, এ-মনোভাব তাঁর সহজাত এবং এ-জন্যেই জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর কবি-জীবনের উন্মেষকালেই স্বাভাবিক যোগাযোগ ঘটেছিল। তবে বাংলা কাব্যের এই কয় দশকের বিবর্তনের ধারায় এই একই মনো-ভাবের নব-উদ্ভূত তৎপরতার তাৎপর্য এই যে, এ বাংলা কাব্যের বিভিন্ন বিভঙ্গের পরিচয় স্পষ্টতর করছে, পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। শামসুর রাহমান ব্যক্তি-বোধ প্রধান কবি। কাব্যরচনার শুরুতে তাঁর এই চেতনা স্বাভাবিক উল্লাসে সঞ্চরণশীল, জীবনের রসগ্রহণে আত্মগতভাবে উচ্চকিত, দ্বিতীয় স্তরে জীবনের ব্যাপকতর সত্য যুগীয় ঘটনা ও সমাজ-তথ্যের সংঘটন ও সংগঠনতাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ এবং তৃতীয় স্তরে এসে এই চেতনাই ব্যক্তি-অধিকারের ক্ষয়িষ্ণুতায় শিহরিত হয়ে নিজস্ব শিল্প-অভিজ্ঞান, জীবনবীক্ষা, বোধ ও দর্শন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথম স্তরের ব্যক্তি-বোধ স্বাভাবিক ও সহজাত, কিন্তু তৃতীয়

স্তরের ব্যক্তি-বোধ আত্ম-অবসানের ভীতিকর আশঙ্কার দ্বন্দ্বপটে প্রতি-ক্রিয়াদীর্ণ ও আত্মরক্ষার তাগিদে উৎকীর্ণ! এই দুই পর্যায়ের ব্যক্তি-বোধ মূলতঃ এক, কিন্তু এদের স্বরূপ ভিন্ন এবং সক্রিয়তার প্রকৃতিও ভিন্ন। এই ভিন্নতা বাংলা কাব্যের এক দীর্ঘকালীন বিবর্তনের পরিচয় বিবৃত করে এবং এর কারণও ব্যাখ্যা করে, যার মূল নিহিত রয়েছে ত্রিশের যুগে, যে সময়ে কবির চেয়ে কবিতা বড় হয়ে উঠেছে অথচ আশ্চর্য এক কাব্য-সম্পদে ধন্য হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতা!

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তনের সঙ্গে শামসুর রাহমানের সংযোগ পূর্বাপর রক্ষিত এবং সাম্প্রতিকতম বিবর্তনের প্রান্ত পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হয়ে আছেন। এ-ক্ষেত্রে আর একটি সত্য এই যে, শামসুর রাহমান তাঁর অগ্রসরমানতার কোথাও মূল্যবোধ-বিচ্যুত হয়ে আবর্তিত হন নি। এমন কি অতি-সাম্প্রতিক কবিতায় বিদ্রোহের উদ্‌বেজনায় ও আত্মস্ফূরণে যেখানে মূল্যবোধ সম্পর্কে উত্তেজনায় অচেতনা ও কোথাও কোথাও অনীহাই প্রধান দৃষ্টিগোচর লক্ষণ, সেখানেও শামসুর রাহমান মূলতঃ কাব্যক্ষেত্রে কবির পরিবেশনির্ভর আত্মপ্রাধান্যের তাৎপর্য সম্পর্কিত মূল্যবোধকে কেন্দ্র করেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আমি এমন কথা বলছি না যে, শামসুর রাহমানের মূল্যচেতনা মাত্রই সর্বজনীন কিংবা সামাজিক অর্থে খুবই কল্যাণধর্মী। শামসুর রাহমানের মূল্যবোধ প্রধানতঃ শিল্প ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু এর সঙ্গে অন্তরঙ্গসূত্রে জড়িত হয়েছে পরিপার্শ্ব, সমাজ ও সময়সজ্ঞানতা। সে যাই হোক, এর আদত গুরুত্ব এই যে, একজন কবির ধারাবাহিক আত্মবিকাশ ও গভীর অস্তিত্ববিন্যাস বা শিকড়-শক্ত সংস্থিতির জন্যে যে-কোন প্রকারের মূল্যবোধ এক অপরিহার্য চাহিদা—শামসুর রাহমানের মূল্যবোধ তাঁর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এক সম্ভাবনাপূর্ণ উৎসভূমি।

উপরে বোধ করি শামসুর রাহমানের কাব্য-স্বরূপের মূল পরিচয়টি বিধৃত হয়েছে। কিন্তু এটাকে একটি স্থিরচিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়তো ভুল হবে। কেননা, শামসুর রাহমানের চিন্তাধারা, উপকরণ-ব্যবহার এবং আঙ্গিকপ্রকরণে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রকাশিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ

'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এবং 'রৌদ্র করোটিতে' এই উক্তির সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। প্রথম গ্রন্থটির শিরোনামার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, মনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্বাভাবিক দৈহিক মৃত্যুর পূর্বে কবির পক্ষ থেকে প্রথম শিল্প-উপাচার। বর্তমান যুগটাই এমন যে, মনকে এ নিষ্পিষ্ট করে, যন্ত্রণাদায়ক পাঁচ আঙুলে হত্যা করে মনের সকল স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য-বাসনা। কিন্তু শিল্পবোধ, কবি মনের ললিতধ্যান ও পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় কল্পনা-উৎস তবু এই সর্বাত্মক ক্ষয়ের মুখে ফুল ফোটানোর প্রেরণা যোগায়। এই চিরন্তন সৌন্দর্যশক্তির মৃত্যুঞ্জয় আধিপত্যের প্রতীক হিসেবেই প্রথম কাব্যগ্রন্থটি উপস্থাপিত। শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটির শিরোনামা 'রৌদ্র করোটিতে' কিন্তু এই প্রতীতির তেজ নেই। ববং আত্ম-অবসানের চূড়ান্ত প্রতীক উপস্থাপিত হয়েছে করোটির ব্যঞ্জনায়। করোটির ওপর রৌদ্রের প্রতিফলনে, 'তবুও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান চিরন্তন'—এই সত্যের ঘোষণা মুখর হয়ে উঠেছে হয়তো, কিন্তু সেখানে গান গাইবার ললিত-সাকি পাখীটি যে তিরোহিত, এই তথ্যটিও আর লুকানো থাকে না। কারণ, করোটি ধ্বংসের বা মীমাংসিত মৃত্যুর প্রতীক। এখানে সর্বনাশকে মেনে নেওয়া হয়েছে, আশাবাদ সান্ত্বনা-সম্বল মাত্র। তথাপি, যুগের কোপন পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘর্ষে নিরঙ্কুশ ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য প্রকাশনার উদ্বুদ্ধমাধ্যম কবিসত্তার অবসান আপাতঃসম্ভব হলেও, জীবনের ন্যূনতম তৎপরতার চাইতে অধিক মহৎ বিশ্বজোড়া উৎকর্ষ উজ্জ্বল ও বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যের অবসান নেই—এই তথ্যই 'রৌদ্র করোটিতে'র বিঘোষিত রায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এতে করে 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' থেকে 'রৌদ্র করোটিতে' পর্যন্ত শামসুর রাহমানের ধারণার একটি পরিণতি-সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। এ-ক্ষেত্রে অ্যাংগ্রী ইয়ংম্যান ও বিটনীক্স গোষ্ঠীর কবিদের চিন্তাধারার পরিণতির সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য রয়েছে। গীন্সবার্গ (আমেরিকা, এ সুপার মার্কেট ইন কালিফোর্ণিয়া), করসো (এরেস কামস এ্যাণ্ড গো), এবং ফার্লিংঘেট্টি (হি) প্রভৃতিও মৃত্যুর মধ্যেই পরিণামী সত্যকে অনুধাবন ও আত্মবিলুপ্তির কলকণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু শামসুর রাহমানের সঙ্গে এঁদের প্রবণতার পার্থক্য এই যে, প্রথমতঃ আত্ম-জিজ্ঞাসায় শামসুর রাহমান এঁদের মত জীবনকে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-উৎসারিত হাসি-কান্না, সুখদুঃখ,

করুণা, ক্ষমা, ভালবাসা-প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতির উৎস হিসেবে অস্বীকার করতে চান না এবং নিঃসঙ্গতাকে 'অবাধমুক্তি'র একমাত্র উপজীব্য মনে করেন না এবং দ্বিতীয়তঃ আপাতঃফ্রাস্ট্রেশন তাঁকে বিকৃতির মধ্যে, মত্ততা-সর্বস্বতা ও সর্বপ্রকারের মূল্যবোধবিচ্যুতিতে বিটদের মত অন্ধভাবে প্ররোচিত করে না।

সে কারণেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়ঃ

> For he has come at the end of the world
> and he is the flippy flesh made word
> and he speaks the word he hears in his flesh
> and the word is
> Death

(ফালিংঘেট্টি, 'হি')

বরং শামসুর রাহমানের মৃত্যুচেতনার সঙ্গে এই সর্বময় নাস্তির পরিবর্তে আরো কিছু সংযোজিত থাকে এবং তা হলো সত্য, সুন্দর, শাশ্বত এবং জীবন সম্পর্কে অনির্বাণ কৌতূহল ও আগ্রহ, হোক না তা ক্ষতদুষ্ট, বিষদাঁতে ছেঁড়া। জীবন সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসে উচ্ছ্বসিত নন, এর সম্ভাবনার উদ্‌গাতাও তিনি নন, কিন্তু কেবলই এর লাঞ্ছিত পাতাগুলো উল্টিয়ে গিয়েও তাঁর মনের সজীবতা নষ্ট হয় নি কিংবা এর সম্পর্কে মমতা ও নিবিষ্টতারও অবসান ঘটে না—এ সত্য নিশ্চয়ই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ!

এবং এখানেই সম্ভবতঃ সাম্প্রতিক কবিতার প্রবণতার সঙ্গে শামসুর রাহমানের সবচেয়ে বড় পার্থক্য সূচিত। এর কারণ নিহিত রয়েছে শামসুর রাহমানের গ্রহণশীল, সচেতন মনোগ্রন্থনের ভিত্তিতে। কারণটি এ ছাড়া কিছুই নয় যে, শামসুর রাহমান ট্রাডিশনে লালিত, কিন্তু অতি-সাম্প্রতিক কবিতা শব্দব্যবহারে, কল্পনা ও আঙ্গিকের অন্তরাল রসায়নের ক্ষেত্রে বারাবর ট্রাডিশনের কাছে হাত পাতলেও, বক্তব্যে, সিদ্ধান্তে ও মেজাজে ট্রাডিশন-বিরোধী। শামসুর রাহমানের কবিতার জোর ট্রাডিশনে বিশ্বাসে এবং এই মৌলিক উপাদানই হয়তো কোন প্রকার সামাপ্তির স্বরে তাঁর কণ্ঠকে

কখনো তোলপাড় করে তুলতে দেয় না। এই মনোবিন্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করলে এ-কথা বলা বোধকরি খুব অবান্তর হবে না যে, কোথাও উচ্চারিত না হলেও, শামসুর রাহমানের সাব-কনসাঁসে ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও আশা ন্যস্ত হয়ে আছে। এ না হলে বীটনীক-দের স্খলন থেকে তিনি যে নিজেকে প্রতিহত করে রেখেছেন শুধুমাত্র রুচি-বৈগুণ্যের জন্যেই, এ-কথা হিসেবে মেলানো মুশকিল।

কিন্তু অন্য একটি বিষয় শামসুর রাহমানের কাব্যের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যগ্রন্থে শামসুর রাহমান নিজস্ব ন্যাক-এর তাগিদে শিল্পগত স্টক ধারণা এবং এর প্রতিবাদী জীবনসংক্রান্ত স্টক উপকরণের সমান্তরাল পরিবেশনা এবং এ বিষয়ে তাঁর শিল্পসর্বস্ব রুচি-অনুযায়ী চিরাচরিত একপেশে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এ-পর্যায়ের বক্তব্যে শুধু যে নতুনত্ব ছিল না তাই নয়, কবির অভিপ্রায়ে নিজস্ব উদ্ভাবনা সংযোজনার সুযোগও ছিল কম। কিন্তু 'রৌদ্র করোটিতে' অবশ্যই লক্ষ্য করতে হয়, এ-ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে তাঁর কাব্য-উপকরণ ও বক্তব্যের মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্তন না হলেও, এর বিষয়ের উপস্থিতি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং স্তরে স্তরে তা পরিপার্শ্ব ও মনের দ্বন্দ্ব-চিহ্নিত। অর্থাৎ তাঁর চেতনার গ্রন্থনে এই পর্যায়ে তিনি জীবনের সঙ্গে জড়িত সংঘাতে আবর্তিত হয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে এবং যে-বক্তব্যে উৎকীর্ণ হয়েছেন তাও সরাসরি—ফার্স্ট হ্যাণ্ড। রুচি ও ঐতিহ্য কোষাগারের অনুকূল উপাদান মাত্র সম্বল করেই পরবর্তী গ্রন্থে তিনি তাঁর কাব্য-অভিব্যক্তির দায় সারে নি। এই তৎপরতায় তিনি জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছেন, আত্মসিদ্ধান্তের পর্যালোচনায় সকল ধারণার উৎসভূমি জীবনের রসায়নাগারে নিজে নিবিষ্ট হয়েছেন, কথা চিত্র বিষয় তাঁরই আত্মার অগ্নিহোত্র থেকে উত্থিত। আর ভাষার ক্ষেত্রেও এই অগ্রসর পদচিহ্নের পরিচয় কম স্পষ্ট নয়। 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র ভাষা মূলতঃ বাংলা কাব্যের সঞ্চিত শব্দের ঐতিহ্যশালা থেকে 'হাতে তোলা' আহরণ। কিন্তু 'রৌদ্র করোটিতে' তা নয়। এর ভাষা কবির নিজস্ব আবর্তনেরই ফল। সে কারণে কবির জীবনাচরণের সক্রিয়তা-উদ্ভূত

স্বাভাবিকতায় প্রাঞ্জল, প্রত্যক্ষ ও স্পন্দিত। প্রথম গ্রন্থের ভাষা সপ্রতিভ, চৌকস, কাব্যময় ও কল্পনা-উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও, ভিত্তিগতভাবে নবিশী হওয়ার দরুণ পোষাকী ও পাটার্ণাইজড্। 'রৌদ্র করোটিতে' তা সহজ, অন্তর-স্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। এই ভাষার উৎস মূলতঃ কবি নিজে, অথচ এর পশ্চাতে রয়েছে আবহমানের কবি-অভিজ্ঞান ও কাব্য-ঐতিহ্যের দ্যুতি ও অনুরণন। শামসুর রাহমানই তাঁর এই ভাষার প্রধান নিয়ামক শক্তি। আর ব্যবহৃত প্রকরণগুলোও এই গ্রন্থে তাঁর বশ হয়েছে। একজন কবির কাছে সবচেয়ে বড় যে অন্বিষ্ট, অন্ততঃ তার দুটোর সন্ধান লাভ করেছেন শামসুর রাহমান 'রৌদ্র করোটিতে'। প্রথমটি হল, জীবন থেকে অভিজ্ঞতা লাভের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র, দ্বিতীয়টি এই অভিজ্ঞতা প্রকাশের অবিভাজ্য, প্রত্যক্ষ ও নিজস্ব ভাষা। এই দুই গ্রন্থের কোন্‌টার ভাষা অধিকতর আবেদনশীল ও শিল্পসুন্দর সে বিচার আমি করছি না এবং এদের কোনটাতে সার্থক কবিতার সংখ্যা বেশী সে হিসেবও করার উদ্দেশ্য আমার নয়—আমি শুধু এ-কথাই বলতে চাচ্ছি যে, একজন কবির নিজস্বতাচিহ্নিত আত্মবিকাশ ও সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের অন্ততঃ দুটো 'রৌদ্র করোটিতে'ই শামসুর রাহমান লাভ করেছেন।

"প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে" কবিতায় শামসুর রাহমান লিখেছেন :

'নিঃশব্দে যেখানে শত হৃতদীপ্তি আত্মার মিছিল
রক্ত আর হলুদ পুঁজের তাণ্ড তুলে ধরে মুখে
দারুণ দুঃস্বপ্নবিদ্ধ বিকারের ঘোরে তমসায়।
ভুলতে না পারা অগণিত স্মৃতির করাল চিহ্নে

কণ্টকিত তাদের বিশীর্ণ সত্তা ; দাঁড়িও সেখানে—
তারপর চলে যেও একা তুমি, করোনা যাচাই।'
এ দৃশ্যের বোধ যাকে পায় সেকি মৃত্যু নয় তবে,
মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়, মরণের অন্ত মানে আছে?
স্বর্গদীপ্ত প্রাণ নিয়ে এসে এ কোথায় কোন দেশে
হারিয়ে ফেলেছি রূপ পশুর রোমশ অন্ধকারে?
এখানে মড়ার খুলি ধূলোয় গড়ায় চারদিকে,
খেলার ঘুঁটির মতো অসহায়, ভবিষ্যৎহীন।

'ভবিষ্যৎহীন' শব্দটি ভবিষ্যতের প্রতি ঔদাসীন্যের বা নিরাসক্ততার দ্যোতক নয় কোনক্রমেই। বরং এতে মনোমত ভবিষ্যতের জন্যে আর্তিই স্পন্দিত। সে যাই হোক, এতে যা মুখ্যতঃ স্পষ্ট তা হল এই যে, প্রথমতঃ পরিপার্শ্বের সঙ্গে কবি একাত্ম নন। পরিপার্শ্ব কবির কাছে—'এ কোন্ দেশ'। দ্বিতীয়তঃ অনাত্মীয় পরিপার্শ্ব বা পরিবেশ কবির ধারণায় সঞ্জাত হয়েছে ফলশ্রুত রূপক এবং প্রতীকের মাধ্যমে। এ কথাটাই এই কবিতার আর একটি পংক্তিতে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: "মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত ল্যাজারস"। অন্যপক্ষে তাঁর সৌন্দর্য-চেতনাও ব্যক্ত হয়েছে মাত্র একটি পংক্তিতে: "হারিয়ে ফেলেছি রূপ পশুর রোমশ অন্ধকারে", যার অর্থ এই যে, পঙ্কিলতায় বিনষ্ট ললিত-সূত্রও তাঁকে বিশুদ্ধ আনন্দ দিতে পারছে না, এ এত সত্য যে এক কথায় তা বলে দেওয়া যায়। কেননা ল্যাজারসের পুনর্জীবনের উল্লাস ছাপিয়ে উৎকটিত হয়ে থাকে তার মৃত্যুর বাস্তবতা, তিন দিন কবরে অবস্থানের সত্য। আর তাই:

লোবানের ঘ্রাণ সহজেই
ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে; নীল আঙুলের
প্রান্তে বিদ্ধ তিনটি দিনের ক্ষমাহীন অন্ধকার।

বস্তুতঃ এ-ক্ষেত্রে প্রতিঘাতী বাস্তবতার উপস্থাপনা এবং বিশুদ্ধ শিল্পবোধের সংবেদনা—উভয় স্তরেই স্টক উপকরণ ও ধারণার বশবর্তী হয়ে আত্ম-উন্মোচন করেছেন শামসুর রাহমান—আমার প্রতিপাদ্যের সপক্ষেই উপরোক্ত বিশ্লেষণের সম্মতি বলে মনে করি। ভাষার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, উদ্ধৃত স্তবকগুলোর পশ্চাতে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্যাটার্ণ অবলীলায় আত্মরক্ষা করে আছে এবং সেই ছকই শামসুর রাহমানের নিজস্ব উদ্ভাবনাতেও মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু 'রৌদ্র করোটিতে'র অনেক কবিতাই এমন সাজানো বাগানের তোলা ফুলের দক্ষ মালা গাঁথা নয়। পূর্ব চর্চিত সত্যের উপর, বিশ্রুত বিরোধের বহুজন কথিত সম্ভাব্য আর্তনাদের ভিত্তিতে নিজের প্রতিভা-জ্বলজ্বলে নক্সার সংযোজনও নয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

একটি প্রখর পাখি ঠুকরে ফেলে দেয় অবিরত
পোকা-খাওয়া মূল্যবোধ। আমরা যে-যার মত পথ চলি,

দেখি বুড়ো লোকটা পার্কের বেঞ্চে ব'সে হাঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে
অভিশাপ ছুঁড়ে দেয়, গাল পাড়ে ভিখিরীকে আর

উল্কি-পরা সরু গলি চমকায় নগ্ন ইশারায়,
বেকার যুবক দৃষ্টি ছায় সিনেমার প্লাকার্ডের
রঙচঙে ঠোঁটে, বুকে আর মর্দিত উরুতে।
পৃথিবীটা চলছে, চলবে যতদিন সূর্য তার
ছিটোবে সোনালী থুতু···কিন্তু যদি
এতই নিশ্চিত এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তবে
কেন সে নব্বুই বছরের বুড়ো কনকনে হাওয়ায় ভাসিয়ে ধবধবে
শাদা চুল এক হাঁটু তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোনায় কত
শান্তির ললিতবাণী একই কেন্দ্রে ঘুর-পাক খাওয়া
অগণিত মানুষের হাটে!

যদি মুখ আদপেই খুলি বলবো কি এপ্রিলের
উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘেমে ঘেমে রোজ হচ্ছি নাজেহাল,
ব্লাউজ পিস্‌টা চমৎকার···তোমাকে মানাবে ভালো
পরো যদি খয়েরী শাড়ির সঙ্গে অথবা হানিফ
করেছে সেঞ্চুরী ফের, দালাই লামার আত্মজীবনীতে কতো
ঘটনার সমারোহ, বলবো কি চলো যাই কফি খাই
হাল ফ্যাসনের কিছু বই পড়া চাই
নইলে লাফাবে তুমি এঁদো ডোবা, কুয়োর ভেতরে।

বলবো কি টাইয়ের নিখুঁত নট শিখলো না বাঁধতে বেচারা
আজ অব্দি, বলবো কি তিনটি সরল রেখা মিলেই ত্রিভুজ,
ঘরে বসে ছুঁচোর কের্তন আজ মিটাবো কি সাধ,
বলবো কি·····

(—"ছুঁচোর কের্তন")

এই কবিতায় বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে হানিফ, রোজ দু'টো আধসেদ্ধ ডিম থেকে ব্লাউজ পিস টাইয়ের নট—সবই আছে। সন্দেহ নেই চারদিকে চোখ মেলে দেখা, ইনডিপেনডেণ্ট এনটিটি ও স্যোসাল বা ইকনমিক এনটিটির সংঘাতে পর্যালোচিত বিষয়ের নিরঙ্কুশ উপস্থিতি ঘটেছে এখানে। দ্বন্দ্বময়

জীবনের গভীরে কবি এখনে অভিসারী। এর বক্তব্য প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ফল। সঞ্চিত বা পূর্বস্থাপিত স্টক ধারণাজাত কোনক্রমেই নয়। ভাষাও তেমনি প্রাত্যহিকতায় অনন্ত উদ্ভিদ্যমান এবং সেই সঙ্গে অনবরত নতুন উৎস থেকে আহরিত। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে, বিষয় এ্যাবষ্ট্রাকসন-বর্জিত হয়েও কাব্য-উপকরণ উপযোগী পরিশীলন লাভ করেছে, ভাষাও প্রত্যক্ষ ও সহজ লওয়া সত্ত্বেও কাব্যভাষা। আর সর্বোপরি কাব্য ও ভাষার ঐতিহ্য-বিচ্যুতও এ নয়। তবে ব্যতিক্রম এইমাত্র যে, ঐতিহ্যের হাত ধরে এ আসে নি—প্রকৃত শক্তিমানের ক্ষেত্রে যেমন হয়, ঐতিহ্য এখানে কেবল সহায়ক উপাদানে পর্যবসিত হয়েছে মাত্র। কবি নিজস্ব ভিত্তি পেলে ঠিক এই রকম পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়। এতে কবিতা পুরোপুরি সিনসিয়ার হওয়ার সুযোগ পায় বলেই কোন আড়াল বা বঙ্কিমতায় ভারাক্রান্ত হতে আর হয় না একে। বস্তুতে আঙ্গিকে উভয়তঃ সহজ ও প্রত্যক্ষ, সজীব ও অন্তস্ফূর্ত হয়ে উঠে। একেই বলা যেতে পারে একজন স্ব-প্রতিষ্ঠ কবির কাছ থেকে পাওয়া অনিবার্য হৃদয়-ফুল।

উপরোক্ত বিচারের পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বস্থানীয় কবিতাগুলোর মধ্যে প্রথম কাব্যগ্রন্থেরও কিছু কবিতা রয়েছে: যেমন, "রূপালী স্নান" "সুন্দরের গাঁথা", "এ্যাপোল্যের জন্যে", "যুদ্ধ"। আর দ্বিতীয় গ্রন্থে এমন কবিতা হিসেবে "শিকি জ্যোৎস্নার আলো", "আত্মপ্রতিকৃতি", "আজীবন আমি", "অন্তিমের তন্ময় দেয়ালে", "রৌদ্র করোটিতে" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বস্তুতঃ জীবনের যোগাযোগে গভীরতর সঞ্চালনে শামসুর রাহমান ক্রমাগত যতই সক্রিয় হয়েছেন ততই ব্যাপকতর ও বিচিত্রতর বিষয় ও উপলব্ধির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থের "খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি", "দুপুরে মাউথ অর্গান", "মেষতন্ত্র" "হাতির শুঁড়", "আমার মাকে", "পিতার প্রতিকৃতি", "একটি মৃত্যুবার্ষিকী", "পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ" প্রভৃতি কবিতা তাঁর এই সৃজন-সঞ্চরণেরই পরিচয় বহন করে। প্রকৃতপক্ষে শামসুর রাহমানের কোন কবিতাই তাৎপর্যহীন নয়—প্রায় সব কবিতাই তাঁর অন্তরঙ্গবোধ ও জীবন ধারণার সঙ্গে জড়িত। এ-তথ্য কাব্য বিষয়ে

তাঁর সিরিয়াসনেসেরই প্রমাণ তুলে ধরে। সেই সঙ্গে সমস্যা অনুধাবন ও সে সবের সূক্ষ্ম, কাব্যিক পর্যালোচনার মেধা ও ক্ষমতাও এতে বিধৃত। এই পরিক্রমায় তাঁর কাব্যে সাবজেকটিভিটির এক আপাতঃসম্পূর্ণ ও অবিকৃত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, যা সাম্প্রতিক কবিতায় বহু বিচিত্র উপকরণের একত্র ও ডিসটরটেড সমাবেশে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় না। তবে তাঁর এই অগ্রসরমানতায় একটা মার খাওয়া (ডিফিটিস্ট) সুর প্রায়ই যেন ধ্বনিত। তাই এ-পর্যায়ের বেশ কিছু কবিতার পরিশেষেই মৃত্যুর অবিসম্বাদিত পরিণাম সম্পর্কে এক আত্মনির্দেশিত স্বগত-উচ্চারণ অপ্রতিরোধ্যরূপে উচ্চকিত হতে দেখি। অনেক ক্ষেত্রে আবার অবস্থা-বর্ণনায় মাত্র সীমাবদ্ধ থেকেছেন তিনি। বৃহত্তম তাৎপর্যে ব্যাপ্ত হওয়ার উৎসাহ পান নি বলে মনে হয় এবং বক্তব্যের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্তের তোড় বহুবার বিভিন্ন বিষয়ে বহুধাপল্লবে বিস্তারিত হয়েও পরিশেষে একই ভাবে সমের মতো এসে আছড়ে পড়েছে। তবে এই সাবজেকটিভিটি তাঁকে বিভিন্নমুখী জীবন-সংবাদ ও স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত করেছে। ফলে তাঁর আত্ম-নিবদ্ধ ললিত-আদর্শবোধ এবং অবিচ্ছিন্ন রুচি ও সৌন্দর্যচেতনা পেরিয়েও বিভীষিকা, সংশয়, সামাজিক স্ববিরোধিতা সংক্রান্ত অবহিতি ও সজাগতা, মানবিক অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বহুমুখী অনুসরণ তাঁর কবিতার উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সত্য এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, শামসুর রাহমানের কব্যে সামগ্রিকভাবে এক ধরনের বিমুখতা রয়েছে। তাঁর মনোগত পরিস্থিতির নিরঙ্কুশ অধিষ্ঠান ঘটেনি বলেই হয়তো তাঁর এই বিমুখতা। অথচ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, জীবনের সঙ্গে নিবিষ্ট তাঁকে হতেই রয়েছে। কিন্তু তাঁর ঐ অসন্তোষ ও বিমুখতা এই নিবিষ্ট যোগাযোগ থেকে কোন পজিটিভ মতাদর্শ, আস্থা, বিশ্বাস, সান্ত্বনা বা আপোষ কিংবা সহজ স্বীকৃতির কোনটাই গড়ে উঠতে দেয় নি তাঁর কাব্যের ব্যঞ্জনায়। শামসুর রাহমান যেন এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণভাবে একনিষ্ঠও। মালার্মেও শিল্পসর্বস্ব নিরঙ্কুশ কবিতায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব সমাজ না হলে নিরঙ্কুশ কবিতাও সম্ভব নয়। সে কারণেই মালার্মের ইচ্ছে সত্ত্বেও তাঁর কবিতার পক্ষেও শিল্পসর্বস্বতার বিশুদ্ধ রায় পাওয়া সম্ভব হয়নি। মালার্মেকে উদ্ভিদ্যমান জীবনের বিস্তীর্ণ ও বহুধাবিস্রস্ত জটলায় বিচরণ করতে হয়েছে। শামসুর

রাহমানের সঞ্চরণের ধাঁচটাও কতটা এই ধরনের। কিন্তু অনুকূল পরিপার্শ্বের অভাব ও নিজের নিরঙ্কুশ উৎসারণের ব্যত্যয় তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন নি কখনই—তাই সর্বত্রই তাঁর মধ্যে এক অসামঞ্জস্যজনিত ক্ষোভ, বাধাহত ক্ষতের সোচ্চার যন্ত্রণা-আর্তি। মালার্মের ক্ষেত্রে অবশ্য এই বিপত্তিগত ক্ষোভ এমন সর্বাত্মক ও সর্বক্ষণিক নয়।

উপমা ও চিত্রকল্পের জন্যে শামসুর রাহমান প্রকৃতির চিরন্তন অঙ্গনের উপর নির্ভর করেছেন, ফলে 'প্যাসটোরাল' সিন তাঁর মধ্যে প্রচুর। বিষয় ও উপাদান সংগ্রহে তিনি নাগরিক ও বিজড়িত জীবনজটলা ও সংশ্লিষ্ট পরিপার্শ্বের উপর নির্ভরশীল, ফলে তাঁর প্রতিফলনের সমর্থক উপকরণগুলো শহরে এবং তাঁর কাব্যের পটভূমিও অনেকাংশেই শহর। অর্থাৎ উপমা ও চিত্রকল্পে তিনি প্রকৃতিনির্ভর এবং বিষয় ও উপাদানে শহরকেন্দ্রিক। স্বাভাবিকভাবেই মেজাজে তিনি আরবান। ট্রাডিশনের বেলাতে শামসুর রাহমান একই সঙ্গে দেশজ ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যবহার করেছেন—বিশেষ করে এ-ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের প্রতিই তাঁর ঝোঁক বেশী। সিম্বলের ব্যবহারে দেশী বিদেশী পৌরাণিক ও সামাজিক উপকরণ একাধারে তিনি কাজে লাগিয়েছেন এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিকোণ বৈদগ্ধের। উপমা, চিত্রকল্প, উপকরণ, ঐতিহ্য ও প্রতীক সন্নিবেশে এই স্বাধিকার সঞ্চরণ থেকে একথা মনে করা সম্ভব যে, শিল্প-ধারণায় বিশেষ এক প্রবণতা থাকলেও, তাঁর আত্মগঠনের তাগিদে ও আত্মপ্রকাশের তাড়নায় তিনি নিজেকে কোন নির্দিষ্ট ঝোঁকে আবদ্ধ করেন নি। নিজের চলাচলে এই স্বাধীনতা ও মুক্তির অক্ষুণ্ণতাই তাঁর কাব্যের সজীবতার অন্যতম কারণ এবং তাঁর সম্মুখগতির মূল প্রেরণাও এটাই।

ডি, ই, এস, ম্যাকসওয়েল উল্লেখ করেছেন,—এলিয়টের ট্রাডিশনের ব্যবহার আর পোপের ক্লাসিক্যাল পুরাণ-কাহিনী বা মিথলজি ব্যবহার একই ধরনের। এই প্রকরণে এমন প্রতীক উপস্থাপনাই হল মূল লক্ষ্য যার ফলে বক্তব্যের অর্থ পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হয়। (The Poetry of T. S. Eliot, Chapter-2, New Classicism) ট্রাডিশন ও সিম্বল ব্যবহারে শামসুর রাহমানের লক্ষ্যও মূলতঃ এই। যদিও তিনি আঙ্গিক, কল্পনা ও চেতনার ক্ষেত্রে

প্রতীকী কবিদের নিকট প্রভূত ঋণী, তবু একথা সত্য যে, প্রতীকী গোষ্ঠির মত প্রতীক ব্যবহার তাঁর কাছে এক অপরিহার্য রীতি ও অনিবার্য কাব্যাদর্শ নয়। এ তাঁর কাছে কম্যুনিকেশন তথা সংবেদনা-সৃষ্টির এক ফলপ্রসূ সহায়ক মাধ্যম মাত্র। বস্তুতঃ আমি প্রথমেই বলেছি. আধুনিক কবিতার সামগ্রিক ঐতিহ্য, দেশী ও পাশ্চাত্ত্যের প্রভেদ না করে, তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর এই অতন্দ্র ও সার্বিক শোষণ সর্বদাই তাঁর আত্ম-বিকাশে পরম সহায়ক হয়ে উঠেছে। শামসুর রাহমানের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই সকল আহরণ আত্ম-উপাদানে পরিণত করেছে এবং কাব্যিক বহিঃপ্রকাশে তাঁর স্বকীয়তারই পরিপূরক হয়ে উঠেছে সেসব।

শামসুর রাহমান মহৎ কবিতা আমাদের দিতে পেরেছেন কিনা, সেটা বড় কথা নয়—আমার উপরোক্ত পর্যালোচনায় আমি একটি মাত্র কথার উপরই জোর দিতে চাই যে, একজন সফল কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য প্রস্তুতি এবং যথার্থ ভিত্তি শামসুর রাহমানের ক্ষেত্রে সংগঠিত হয়েছে। এই সংবাদ এখনও হয়তো প্রতিশ্রুতির সংজ্ঞায় সীমায়িত রাখা যায়। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, এ প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই নিজের সপক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নিদর্শন দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছে।

পঞ্চাশ-পরবর্তীকালে আর যে কয়জন কবি সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহ্‌মুদ, লতিফা হিলালী, জিয়া হায়দার ও আবদুস সাত্তারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা কাব্যের এই মূল ধারার পাশাপাশি অন্য দুটো ধারাতেও কিছু কিছু কিছু অনুশীলন চলেছে। একটি সমাজ সচেতন ধারা এবং অপরটি পাকিস্তানী ঐতিহ্য-সজাগ ধারা। বাংলা কাব্যের মূল ধারার সঙ্গে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন না হয়েও উক্ত দুটো ধারায় যথাক্রমে আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ১৯৬০-এর পর অতি-সাম্প্রতিক যে কাব্য-প্রয়াসের সূত্রপাত হয়েছে তা থেকে কোন প্রকৃত কবি বেরিয়ে আসতে পারেন কিনা তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয়।

পরিশিষ্ট

কবি মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের বিশেষ এক মিল রয়েছে। তুলনাটা প্রতিভাগত নয়, পরিস্থিতিগত।

বাংলা কাব্যে এপিক অব গ্রোথ ছিল, কিন্তু নতুন চিন্তাধারায় অনুরক্ষণশীল লিটারারী এপিক বা রোমান্টিক এপিক ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সমাজের কাঠামো ছিল অচলায়তনের মত, বিবর্তনহীন। গ্রামীণ বনিয়াদের মধ্যযুগীয় ভোল পাল্টাবার তেমন চাড়া ভেতর থেকেও আসে নি। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ও সামাজিক প্রবণতায় পরিবর্তনমুখী তাড়নারও উদ্ভব ঘটবার সুযোগ হয় নি। কারণ, মুঘল যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি ছিল না বলে ব্যক্তিবিশেষের অর্থকরী উদ্যম উদ্যোগ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ লক্ষ্য ও বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও চিড় ধরবার কোন অবকাশ ছিল না। সম্রাটকেই আদি ও অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন আদর্শ ও উৎস জেনে সমাজ স্থির হয়ে ছিল। ইংরেজের আবির্ভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব শুধুমাত্র আমাদের চিরাচরিত সমাজ-কাঠামোতেই নাড়া দিয়েছিল তা নয়, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী ব্যক্তি-মানসও পুরাতনের খোলস ছেড়ে নতুন জীবনজিজ্ঞাসা ও সামাজিক বিবর্তনের সমার্থক যুগোপযোগী সৃজনী-দায়িত্বের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু নবীন বাংলা কাব্যের প্রথম আধুনিক কবি তাঁর উদ্বুদ্ধ চেতনা নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠবার মুহূর্তেই দেখতে পেলেন, নিজ দেশের কাব্য-সাহিত্যের পশ্চাত পটভূমি ভিন্নভাষী, তাঁর নব অভিযানের অনুকূল তো দূরের কথা, তাঁর অনুপ্রেরণার উপযোগী ঐতিহ্য পর্যন্ত এতে নেই। মধুসূদনের কালে পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য ধারাগুলোতে রোমান্টিকতার পরিণতির কালও পেরিয়ে গেছে। ওয়ার্ডওয়ার্সর্থ তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ দশকে প্রবেশ করেছেন, শেলী কীটস্‌ বায়রণ রোমান্টিকতার শ্রেষ্ঠ ফসল নিঃশেষে তুলে দিয়ে লোকান্তরিত হয়েছেন—ইংরেজী সাহিত্যে এসেছে ভিক্টোরীয় যুগ ফরাসী দেশে বদেলিঁয়র মালার্মের হাতে প্রতীকী রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছে, জার্মানীতে বিদ্রোহী রোমান্টিক হাইনে তাঁর ব্যক্তি-চেতনার বিদ্যুৎ ঝলসিয়ে রাজরোষে স্বদেশ পরিত্যাগ করে ফরাসী দেশে প্রস্থান করেছেন।

মাইকেলও ছিলেন রোমান্টিক—রোমান্টিক কবিদের চেতনাই তাঁর মৌলিক ভিত্তিকে সংগঠিত করেছে। কিন্তু মাইকেলকে শুরু করতে হল লিটারারী মহাকাব্য লিখে, দান্তে যা করেছেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মিলটন যা করেছেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। রেনেসাঁর উদ্ভবের পর সাহিত্যের বিবর্তন-ক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধের প্রথম ধারক রোমান্টিক এপিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই পাশ্চাত্ত্যে এর ভূমিকা নিঃশেষ হয়েছিল, সেখানে কাব্যক্ষেত্রে রোমান্টিক লিরিকের উদ্ভব হয়েছে। আর মধুসূদনের লিরিকাল মাইণ্ড সত্ত্বেও, নবচেতন বাংলা কাব্যের এক পরম অভাব পূরণের দায় প্রথমেই তাঁকে সারতে হল অন্ততঃ একটি মহাকাব্য লিখে। সময় বিচারে এইটে এ্যানা-ক্রনিজম। কিন্তু নবীন খাতের উদ্ভিন্ন বাংলা কাব্যের ঘাটতিপূরণের পরিপ্রেক্ষিতে এ ছিল এক অপরিহার্য চাহিদা। ফলে দেখা গেল 'মেঘনাদবধ কাব্য' সঙ্গে সঙ্গে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ পাঠক-মানস কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই একটি মাত্র সফল মহাকাব্যই নবধারার বাংলা কাব্যের ভিত্তিগত অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে, অনিবার্য প্রয়োজন সাধিত করেছে। এরপর লেখা মহাকাব্য-গুলো অকাল ফসলের মতই প্রধানতঃ একাডেমিক কৌতূহলকেই নিবৃত্ত করে মাত্র। মধুসূদনও আর কোন মহাকাব্য লেখেন নি—তিনিসনেট এপিলগ ও লিরিক রচনায় পরে অধিকতর সময়োচিত আবেদনে সাড়া দিয়েছেন।

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যও এ্যানাক্রনিজম। তিনিও এক বিরাট অভাব পূরণের দায় সেরেছেন, অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং ফলে মধুসূদনের মতই তড়িৎ আগ্রহে তাঁর কাব্য পাঠকসমাজে গৃহীত হয়েছে। এখানেই এঁদের মিল। তবে প্রশ্ন এই, জসীমউদ্‌দীনের কাব্য এ্যানাক্রনিজম কেন এবং বংলা কাব্যের কোন্ বাঞ্ছিত অভাব পূরণে তাঁর ভূমিকার কৃতিত্ব?

বালাড রচনা করে জসীমউদ্‌দীন বাংলা কাব্যের অসম্পূর্ণতা পূরণের এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং লোক-জীবন ও লোক-উপকরণ বাংলা কবিতায় সংযোজিত করে তিনি পাঠক-সমাজের সংবেদনশীলতায় তাৎক্ষণিক অনুরণন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নবীন সাংস্কৃতিক উদ্যমের ফলে বাংলা কাব্য প্রাচীন ধারা

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, লৌকিক সৃজনীপ্রয়াসের সঙ্গেও আর এর পক্ষে সংযোগ রক্ষা সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্ত্যের উন্নত সাহিত্য-সমূহে বালাড জাতীয় রচনা যে-সময়ে উৎকর্ষের শীর্ষচূড়ায় পরিণতি লাভ করেছে, তারও অনেক পরে বাংলা কাব্যে রেনেসাঁর মূল্যবোধসম্পন্ন সচেতন প্রয়াসের শুরু হয়ছিল। এই নতুন প্রয়াসে কাব্যের সকল ধারাতেই নব নির্মাণ চলেছে। ভিত্তিপটের এবং কাব্য-অঙ্গের সকল অসম্পূর্ণতার দায় শোধ করে সময়োপযোগী চেহারায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহজাত বিবর্তন ও অগ্র-সরমানতার কাজ দ্রুত সাধিত হয়েছিল বাংলা কাব্যে। এ পর্যায়ে রবীন্দ্র-নাথের সচেতন ও সর্বতো তৎপরতার বিষয় সর্বজনবিদিত এবং তৎপরবর্তী ত্রিশের কবিদের ভূমিকাও বহুশ্রুত। কিন্তু বাংলা কবিতায় প্যাসটোরাল কবিতার উদ্ভব হলেও, লোকজীবন-আশ্রিত কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য ত্রিশের দশক পর্যন্ত লেখা হয়নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এক বিরাট ফাঁক রয়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। অথচ শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য ভিন্নখাতে বইলেও, বাঙালী পাঠকের রুচি ও রসবোধ তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য, লৌকিক আস্বাদন ও গ্রহণপ্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি কখনোও। কারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রাম থেকে একেবারে আলাদা হতে পারেনি এবং শিক্ষিত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় মানসম্পন্ন চালু সাহিত্যে স্থান না পেলেও লৌকিক সাহিত্য-শিল্প-প্রয়াস পাশাশাশি লোকজ খাতে সর্বক্ষণই বাঙালী-মানসের রসপিপাসা মিটিয়ে চলছিল। জসীমউদ্‌দীনের হাতে লৌকিক জীবন ও উপকরণ আধুনিক আঙ্গিকে ও রুচিতে সজ্জিত হয়ে পরিবেশিত হওয়া মাত্রই তা স্বীকৃত ও গৃহীত হতে এতটুকুও দেরী হল না। এর প্রধান কারণ হল এই যে, প্রথমতঃ বাঙালী রসবোধে এই চাহিদা সর্বদাই ছিল—অমার্জিত ও অশিক্ষিত অন্তরাল শিল্পপ্রয়াসই এই অনিবার্য রসপিপাসা মিটিয়েছে এতদিন। শিক্ষিত ধারায় বাংলার নিজস্ব ও চিরাচরিত উপকরণমালা ও রসপ্রকৃতির বিশেষ রূপায়ণ ছিল না বলে একটা অপ্রত্যক্ষ ও অনুচ্চারিত অসম্পূর্ণতার রেশ সবসময়েই বিদ্যমান ছিল। ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি লোকগাথার পুনরাবিষ্কার বরং মার্জিত ও স্বীকৃত কাব্যে এ-ধরনের অভাবকেই দীর্ঘশ্বাসমথিত হা-হুতাশে বারবার উচ্চকিত করে তুলেছে। ফলে এতদ্‌সংক্রান্ত একটা সুনিশ্চিত, সচেতন ও সুনির্দিষ্ট উদ্যম এক বিশেষ মূল্য-

বোধের সমর্থন পেয়েছিল। বাঙালীর আত্মস্থ ও স্বাভাবিক, সহজাত ও প্রিয় রসবোধে সহজেই সাড়া জাগাতে পেরেছিল। দ্বিতীয়তঃ উনবিংশ শতাব্দীতে সূচিত নতুনতর সৃজনী উদ্যমে কাব্যক্ষেত্রে আঙ্গিকগত দিক থেকেও বালাডের অভাব ছিল। দীর্ঘ এক শ' বছরের পরিধিতে অনেক দায়ই সারা হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে হাত পড়েনি। জসীমউদ্‌দীন একটি মাত্র সফল বালাড 'নক্‌সী-কাঁথার মাঠ' লিখে সৃজনী পরিপ্রেক্ষিতে এই অস্বস্তিকর ফাঁকটি ভরাট করে-ছিলেন। এ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'র মতো 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ'ও এ্যানাক্রনিজম তো বটেই এবং এমন কি উভয়-ক্ষেত্রেই চাহিদার দাবী ঐ একটি করে উপাচারেই মিটে গিয়েছিল। জসীম উদ্‌দীন অবশ্য আরো একটি বালাড লিখেছেন ('সোজন বাদিয়ার ঘাট'), কিন্তু পাঠকসমাজের রসবোধ ও কৌতূহল 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ'কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত, দ্বিতীয়টি অতিরিক্ত সম্ভার বই আর কিছু নয়। এ্যানাক্রনিজমের ক্ষেত্রে এই বোধহয় নিয়তি—এর বিষয়ের বিকাশ ও অনুশীলন অসময়োচিত বলেই হয়তো অধিকতর অবদান আর আবেদন জাগায় না, প্রশ্রয়ও পায় না। এর প্রমাণ বোধ করি এই যে, জসীমউদ্‌দীনের গাথাকাব্যের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষায় আরো অনেক কাব্যপ্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে, কিন্তু সেসব পাঠকের আগ্রহে ঠাঁই পায় নি, সাহিত্যের আলোচনার সীমাতেও আসতে পারে নি—লোক-চক্ষুর অন্তরালেই ব্যর্থ প্রয়াস হিসেবে রয়ে গেছে। মধুসূদন-পরবর্তী মহাকাব্য-গুলো নতুন ধারার বাংলা কাব্যের প্রথম যুগে রচিত বলেই হয়তো তবু একাডেমিক আগ্রহ উদ্রিক্ত করতে পেরেছিল, কিন্তু জসীমউদ্‌দীন-অনুসারী গাথাকাব্যের ভাগ্যে সে সুবাদ ঘটে নি।

মধুসূদনের সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের তুলনায় পরিপ্রেক্ষিতটা এই। দুজনে বাংলা কাব্যক্ষেত্রের বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় অসম্পূর্ণতার দায় পরিশোধের নায়ক হিসেবে পাঠকমন জয় করেছিলেন এবং দুজনেরই প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়েছিল আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত মূহূর্তেই, কবিতার ইতিহাসে যা প্রায় ঘটে না। এর কারণ তাঁরা এমন কিছু দিয়েছিলেন, যা চেতনা ও বিষয়গত ভাবে অনেক আগেই পাওয়ার কথা এবং যা গ্রহণ করার জন্যে পাঠকমন পূর্বনির্ধারিতরূপেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। একথা সত্য না হলে, 'মেঘনাদবধে'র ঐ দুরূহ ভাষার আবরণ ভেদ করেও পাঠকমন সেই মহাকব্যের কাছে অত

তৎক্ষণাৎ পৌঁছত না! জসীমউদ্‌দীনের বেলায় অবশ্য ভাষার অন্তরায় ছিল না। তাঁর কাব্যের ভাষা বিষয়ের সহজাত, এ-দেশের স্বাভাবিক ভাষা। বরং তৎকালীন বাঙালী মানসের দেশের ব্যাপকতর স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার তথা মাটির কাছাকাছি যাওয়ার অভিলাষী নতুন বিবর্তিত চেতনার তারে এ সবিশেষ আবেদন-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। মধুসূদনের তুলনায় জসীম উদ্‌দীনের প্রতিভার দৈন্য থাকলেও, এই ভাষা ও উপকরণগত অন্তরঙ্গ আবেদন-সৃষ্টির সূত্র ধরেই পাঠকমন-জয়ে জসীমউদ্‌দীন যথেষ্ট উতরে গেছেন। অবশ্য আলোড়ন-সৃষ্টিতে মধুসুদন ও জসীমউদ্‌দীন একই সমান সার্থক, এমন কথা আমি বলছি না। আমি এই দুইজনের সৃজনীক্ষমতা ও প্রতিভার তুলনা করছি না কোনক্রমেই, শুধু পরিস্থিতির, প্রতিফলনের এবং জনস্বীকৃতির সমগোত্রীয়তার দিকটা বিশ্লেষণ করছি মাত্র।

বালাড রচনা করে জসীমউদ্‌দীন বাংলা কাব্যে পরিচিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপট বিস্তৃত ও পাকাপোক্ত করেছেন তাঁর কবিতায় লোক-জীবন ও লোক-উপকরণ সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক ব্যবহারের দ্বারা। মাইকেলকে অমর করার জন্যে যেমন 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই যথেষ্ট, জসীমউদ্‌দীনের বেলাতে 'নক্‌সীকাঁথার মাঠ' তেমন ফলদায়ক নিশ্চয়ই নয়। এই দুই গ্রন্থের সৃজনী নিদর্শন হিসেবে দুস্তর পার্থক্যই এর একমাত্র কারণ নয়। এর গভীরতর কারণ এই যে বাংলা কাব্য তখন অনেক পরিপক্ষ হয়েছে—জসীমউদ্‌দীনের উদ্যমে কেবলমাত্র আঙ্গিকটাই নতুন ছিল লোক-বিষয়ক চেতনা ও লোক-বিষয়ের অনুপ্রবেশ কোনক্রমেই নতুন ছিল না। তবু এ-ক্ষেত্রে জসীমউদ্‌দীনের বিশেষত্বের কারণটি এই যে, গাথাকাব্যের আঙ্গিকঘটিত অভাব মিটানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকজীবনের ও লোকচেতনার একটি ঐতিহ্য-অনুসৃত ও প্রতিনিধিত্বশীল এ্যাটাচমেণ্টের উপাদান বাংলা কাব্যে পূর্বাপর রক্ষিত করে পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্যে উপস্থিত করেছিলেন। সর্বোপরি এ-ব্যাপারে তিনি ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন এবং সর্বাত্মকরূপে নিবিষ্ট ও এককেন্দ্রিক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন, যা এতদ্‌সংক্রান্ত সচেতনতায় প্রতীকের মত মর্যাদা পেতে পারে। এমন উৎসর্গীকৃত ও আদর্শবদ্ধ লোককেন্দ্রিক উৎসারণ সমসাময়িক অন্য কারো বেলায় ঘটেনি বলেই এই পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা বিশেষত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং বলা চলে জসীমউদ্‌দীনের ত্বরিত প্রতিষ্ঠার কারণ 'নক্‌সী

কাঁথার মাঠ' হলেও, তাঁর গভীরতর ভিত্তি অর্জনের কারণ হল, লোকজীবন-ঘনিষ্ঠ উপাদানের ক্রমাগত ধারাবাহিক উপস্থাপনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আধুনিক চেতনা ও নবপরিগৃহীত বিশেষ মূল্যবোধ।

তুলনা দিয়ে শুরু করেছি, তার জের টেনেই শেষ করতে চাই! মধুসূদন বাংলা কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্‌গাতা। এই চেতনার প্রবক্তা হিসেবে বাংলা কাব্যে তিনি চিলেন যুগোপযোগী, অগ্রবর্তী চিন্তার নায়ক। তাঁর মহাকাব্য এ্যানাক্রনিজম হতে পারে, কিন্তু এতে এই মূল্যবোধের প্রবর্তনায় বাংলা কাব্যে তিনি ছিলেন প্রথম পুরুষ। জসীমউদ্‌দীনেরও এমনই একটি সময়োপযোগী পজিটিভ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। সেটা এই যে, গ্রামীণ সমাজচেতনার উপস্থাপনায় জসীমউদ্‌দীনই বাংলা কাব্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন উপহার দেন। অবশ্য এ-ব্যাপারে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, মধুসূদনের পূর্বসূরী ছিল না কিন্তু জসীম উদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিকুলের বিশেষ করে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সহায়তা লাভ করেছিলেন তাঁর এই বহিঃপ্রকাশে। তবে জসীম উদ্‌দীন স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব হতে পেরেছেন এইজন্য যে, গ্রাম তাঁর কাছে এক পরিপূর্ণ বিশ্ব, তাঁর নিজস্ব শিকড় এর মধ্যে প্রোথিত। এক বিস্তৃত পার্‌স-পেকটিভের মধ্যে লোকজীবনের তাৎপর্য তিনি বিধৃত করতে পেরেছেন, এর বর্তমান এর আবহমান ঐতিহ্যের সূত্রে তিনি গেথে তুলতে পেরেছেন এবং তিনিই প্রথম কবি যিনি গ্রামীণ উপকরণ শুধু নয়, এর ভাষা ও ভাব প্রকাশের মেজাজ, কল্পনাপ্রবণতা ও ভংগীকেও বাংলা কাব্যের ইতিমধ্যে সুগঠিত ও অগ্রসর শিল্প সভ্যতায় আত্মমর্যাদাসহ স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। লোক-জীবনের বাইরে তাঁর অস্তিত্বের অর্থ নেই—এমন একনিষ্ঠতাকে সমকালীন মার্জনায় শিল্পবোধে এবং আঙ্গিকে তিনি সজ্জিত ও গঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর দ্বারা বাংলা কাব্যের স্বীকৃত প্রধান ধারা ও অবহেলিত লোকধারার একাত্ম মিলনের ক্ষেত্রে একটি স্বস্তিকর অন্তরায় অন্তর্হিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে। এতে এক অত্যন্ত বাঞ্ছিত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাঁর হাতে। বস্তুতঃ এই মিলন-সম্ভাবনার তাৎপর্যময়তায় জসীমউদ্‌দীন এক ফলিত নিদর্শন যা সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসম্পদেও তুচ্ছ নয়।